দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য যেহেতু উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী এবং নারীচেতনাবাদী এই দুটি অবস্থান থেকে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাসের পুনঃপাঠ, পাঠক প্রতিক্রিয়াতত্ত্ব উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ এবং নারীচেতনাবাদ সম্পর্কে আলোচনা তাই অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

অধ্যায় বিন্যাস ঃ-

২.১ - পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।

২.২.১ - উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী পাঠকের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।

২.২.২ - বাংলায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ঃ একটি উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী বিশ্লেষণ।

২.৩.১ - নারীচেতনাবাদী পাঠকের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।

২.৩.২ - বাংলায় নারী বিষয়ক চিন্তাধারা।

২.৪.১ - বৃত্তে সমন্বয় ঃ ঔপনিবেশিক বাংলার বিশেষ পরিবেশে উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ এবং নারীচেতনাবাদের ঐক্যসূত্র সন্ধান।

২.১ - পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ (Readers-response criticism) সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।

পাঠক প্রতিক্রিয়াতত্ত্ব অনুযায়ী পাঠ আসলে একটি নির্মাণ। পাঠক প্রতিক্রিয়াতত্ত্ব মনেকরে কোনো পাঠকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণে। অর্থাৎ পাঠকৃতির তাৎপর্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় পাঠক তার অভীষ্ট বা প্রত্যাশা (Expectation) অনুযায়ী পাঠকৃতিকে যেভাবে দেখেন, পাঠকৃতি সেই তাৎপর্যই পাঠকের চেতনায় এনে দেয়। ফলতঃ লেখকের ভূমিকা এক্ষেত্রে হয়ে পড়ে পাঠকৃতির রচয়িতা বা উপস্থাপক মাত্র,

চিরাচরিত কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বা তাৎপর্যের গণ্ডিতে লেখক তাঁর প্রতিবেদনকে বেঁধে রাখতে পারেন না বা পাঠকৃতি নিজেও বদ্ধ থাকে না। পাঠক তার মানসিকতা অনুযায়ী যে তাৎপর্য খুঁজে পান, সেটাই সেই পাঠকের কাছে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ তাই গুরুত্ব আরোপ করে পাঠকের পাঠ প্রক্রিয়ার ওপর। "Readers response criticism does not designate any critical theory, but a focus on the process of reading a literary text that is shared by many of the critical modes."[১]

আমাদের পাঠাভ্যাস যেহেতু তৈরি হয় আমাদের Ideology বা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে, তাই পাঠকের দ্বারা কোনো পাঠকৃতির বিশ্লেষণেও সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণের বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়। আর দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভিন্নতার ফলেই একই পাঠকৃতি একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পাঠকের কাছে একই কালপর্বে কখনই একই তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হতে পারে না। যেমন মহাশ্বেতা দেবীর *স্তনদায়িনী*, একজন নারীচেতনাবাদী পাঠক এই পাঠকৃতি থেকে যে তাৎপর্য খুঁজে পাবেন, উপনিবেশোত্তর চেতনানিষ্পন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো পাঠক এই একই পাঠকৃতির মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের প্রতি উন্নত বিশ্বের শোষণের ভাবকল্পের সন্ধান পেতে পারেন। আবার ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্তের (Horizon of expectation) সঙ্কোচন বা প্রসারণের ফলে একই পাঠকৃতি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে আসে। একারণেই *রামায়ণ* পুনর্নির্মিত হয় *মেঘনাদবধ* এ। আবার *মেঘনাদবধ* উনিশ শতকের পাঠকের কাছে যেভাবে গৃহীত হয়েছিল, বর্তমান কালপর্বের পাঠকের কাছে ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে আসছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী* সমকালীন বা তারও কিছুটা পরবর্তী সময়ে পাঠকের কাছে যে তাৎপর্য নিয়ে এসেছিল, সাম্প্রতিক উপনিবেশোত্তর চেতনানিষ্পন্ন পাঠে *কঙ্কাবতী* ভিন্ন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমকালে যেভাবে পঠিত হয়েছিল, আজকের পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্তের প্রসারণের ফলে নব নব উদ্ভাসনের আলোয় উদ্ভাসিত

হচ্ছে। এমনটা হয় যেহেতু পাঠকভেদে দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা বিভিন্ন হয়। নচেৎ অচল অনড় অপরিবর্তনীয় যথাপ্রাপ্ত পাঠকৃতির পরিবর্তমান চলিষ্ণু পাঠকসত্তার মনোমুকুরে প্রতিভাত হয়ে নব নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হওয়া ছাড়া পাঠকৃতির এই স্থানুত্ব থেকে উত্তরণের কোনো গত্যন্তর থাকে না। কোনো পাঠকৃতিকে সার্বভৌম বলে একমাত্রিক ভাবে গ্রহণ করলে পাঠকৃতির তাৎপর্য চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে যায়। লেখক/কথক শুধুমাত্র যে তাঁদের লেখার মধ্যদিয়ে পাঠকৃতি সৃষ্টি করেন তাই নয়, বরং পাঠকও সেই পাঠকৃতিতে তাৎপর্য দান করে এক অর্থে তাৎপর্যের স্রষ্টার শিরোপা পেতে পারেন, তাৎপর্যদান তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। সমালোচকের ভাষায় –

> "Reader response critics of all theoritical persuasion agree that, at least to some considerable degree, the meanings of a text are the 'production' or 'creation' of the individual reader, hence that there is no one 'currect' meaning for all readers either of the lienguistic parts or of the artistic whole of a text."[২]

পাঠক তার দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তাৎপর্য সৃষ্টি করে নেন বলে যত পাঠক, তত তাৎপর্য পাওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত আমরা সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য্যের মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি -

> "সচেতন পাঠক হিসেবে যখন পড়ি, আসলে আমরা তখন লিখি, বা বলা ভালো, পুনর্লিখন করি। লেখকের পরিসরকে সর্বব্যাপী বলে মানি না কিছুতেই, পড়ুয়ার পরিসরকে নিরন্তর প্রসারিত করে চলি। কেননা তাৎপর্যে পৌঁছাতে হবে আমাদের; একক পাঠে এই প্রক্রিয়া শেষ হয় না বলে পুনঃপাঠের পরম্পরা চলতে থাকে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। এবিষয়ে জোনাথন কুলেরের একটি মন্তব্য খুব প্রাসঙ্গিক ঃ For the reader the work is not partially created but, on the one hand, already

completed and inexhaustible - one can read and reread without ever grasping completely what has already been made and on the other hand, still to be created in the process of reading, without which it is only black marks on paper."[৩]

কোনো পাঠকৃতিরই চূড়ান্ত কোনো তাৎপর্য নির্দিষ্ট হতে পারে না বলেই প্রতিটি পাঠই আসলে সম্ভাব্য তাৎপর্যের দিকে তর্জনী সঙ্কেত করে।

হ্বলগ্যাঙ্ আইজের (Wolfgang Iser) অবভাসবাদের (Phenomenology) চিন্তাসূত্রকে পাঠকের পাঠ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন। অবভাসবাদ অর্থনির্ণয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অবভাসবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষের মনই সমস্ত অর্থের কেন্দ্র ও উৎস, ব্যক্তি মানুষ কোনো ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে আসলে সেটাই আবিষ্কার করে, যা তার চেতনায় প্রতিফলিত হয়, যা সে দেখতে চায়। আইজের এই তত্ত্বকে পাঠকৃতি ও পাঠকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে বলেছেন কোনো পাঠক আসলে কোনো সাহিত্যিক প্রতিবেদনে তাই দেখতে পায়, যা সে দেখতে চায়, তার প্রত্যাশা তাকে যা দেখায় সেটাই সে দেখে, তার Ideology তাকে যে তাৎপর্যের সম্মুখীন করে, সেই তাৎপর্যই সে খুঁজে পায়। আইজেরের মতে এটা সম্ভব হয় যেহেতু সাহিত্যিক পাঠকৃতি নিজের মধ্যে কিছু শূন্যায়তন (gap) প্রচ্ছন্ন রেখে দেয়। পাঠক এই শূন্যায়তনগুলোকে চিহ্নিত করে অর্থদ্যোতনা দিয়ে পূর্ণ করে তোলেন। বলা বাহুল্য এই আরোপিত অর্থ তৈরি হয় পাঠকের ভাবাদর্শের সক্রিয় প্রভাবে। "In Isers view the literary text, as a product of the writer's intentional acts, in part controls the reader's responses, but always contains a number of 'gaps' or 'interterminate elements'. These the reader must fill in by a creative participation with what is given in the text before him. The experience of reading is an evolving process of

anticipation, frustration, retrospection, reconstruction and satisfaction."[৪] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পাঠকৃতিতে এই শূন্যায়তনের উপস্থিতি কোনো ত্রুটি নয়, বরং এই শূন্যায়তনের উপস্থিতি পাঠকৃতির অনেকার্থদ্যোতনার (heteroglossia) সহায়ক।

আমাদের গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্র-উপন্যাসে চরিত্রের হয়েওঠা (becoming) বা মানসিক জটিলতা ঔপন্যাসিকের অভীষ্ট হওয়ায় বাইরের ঘটনার ডিটেলিং বা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই বর্জন করেছেন। এরফলে যে শূন্যায়তন উপন্যাসগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তা পাঠকের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। ঔপন্যাসিকের 'না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে' রয়ে গেছে পাঠকৃতির প্রসারণশীলতার সম্ভাবনা।

২.২.১ - উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী পাঠকের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ঃ-

সাম্প্রতিক তত্ত্ববিশ্বে উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ তত্ত্ব হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সমালোচনা করে এর অসম্পূর্ণতা স্ববিরোধ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দিকগুলি তুলে ধরে এর থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের অন্যতম প্রধান কৃত্য। উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ সংক্রান্ত চিন্তাধারার বিক্ষিপ্ত স্ফুরণ বিভিন্ন সময় দেখা গেলেও মোটামুটি ১৯৯০ সনে এটি একটি নির্দিষ্ট ভাবনাপ্রস্থান রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

> "Postcolonial criticism emerged as a distinct category only in the 1990s. It is not mentioned, for instance, in the first edition of selder's A Reader's Guide to contemporary Literary Theory (1985) or Jeremy Hawthorn's A Concise Glossary of contemporary Literary Theory (1992). It has gained currency through the influence of such books as: In other worlds

(Gayatri Spivak, 1987); the empire writes back (Bill Ashcraft, 1989) Nation and Narration (Homi Bhabha, 1990) and culture and Imperialism (Edward said, 1993). An important collection of relevant essays (though it does not use the term postcolonialism') is 'Race' writing and Difference (1986),...”[৫]

এডোয়ার্ড সঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* গ্রন্থে উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের আদি বীজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মিশেল ফুকোর প্রতাপতত্ত্বের থেকেও উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ আদি প্রেরণা পেয়েছে।

“An important text in establishment the theory and practice in this recently developed field of study was orientalism (1978) by the Palestinian- American scholar Edward said, which applied a revised form of Michel Foucault's his toricist critique of discourse to analyze what he called "Cultural Imperialism". This mode of imperialism imposed its power not by force, but by the effective means of disseminating in subjugated colonies a Eurocentric discourse that assumed the normality and preeminence of everything "Occidental," as an exotic and inferior other. Since the 1980s, such analysis has been supplemented by other theoretical principals and procedures including Althusser's redefinition of the Marxist theory of ideology and the deconstructive theory of Derrida. The rapidly expanding field of postcolonial studies, as a result,

is not a unified movement with a distinctive methodology."[৬]

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অসম্পূর্ণতার দিকটি তুলে ধরে প্রকৃত আধুনিকতার অন্বেষণ উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের কৃত্য, ঔপনিবেশিক সমাজে ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাদের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার লক্ষ্যে সবসময় সবক্ষেত্রে যে পেশি-শক্তির ব্যবহার করে, তা নয়, পেশি-শক্তির দমন নীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায় ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি। ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে জ্ঞানও পীড়নের হাতিয়ার, উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ মনে করে জ্ঞানতাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদকে শাসক শ্রেণী প্রতাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ভাবাদর্শ প্রচার করে। ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রচারিত এবং আরোপিত ভাবাদর্শের মোহে নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হয়ে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরা শাসিতের নির্দিষ্ট করা পথে চলে জন্ম দেয় এমন এক সংস্কৃতির, যা তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির মধ্যে তার শেকড় খুঁজে পায় না। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রকল্প অনুযায়ী সুকৌশলে নির্মিত এই বিজাতীয় সংস্কৃতিই ক্রমশঃ ঔপনিবেশিক সমাজে একক মান্যতা পেয়ে যায়, পেয়ে যায় আধুনিকতার শিরোপা, ঔপনিবেশিক সমাজে বিকাশমান সৃজনশীল কর্মে এই আধুনিকতারই চর্চা চলতে থাকে। ফলত: ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শক্তি একদিন বিদায় নিলেও তাদের সৃষ্ট এই আধুনিকতারই চর্চা চলতে থাকে দীর্ঘদিন। এই শেকড়হীন আধুনিকতার স্বরূপ সন্ধান করে প্রকৃত আধুনিকতা, যার শেকড় ছড়িয়ে থাকবে দেশজ ঐতিহ্যের মধ্যে, সেই প্রকৃত আধুনিকতার সন্ধানী উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ কোনো কালিক নিয়মে বদ্ধ নয়, অর্থাৎ 'Postcolonial' বা উপনিবেশোত্তর – এই শব্দবন্ধে 'Post' বা 'উত্তর' বলতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সময়কে বা ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী সময়কে বোঝায় না। বস্তুতঃ ঔপনিবেশিক সমাজে যখন তাদের আদর্শে তৈরি আধুনিকতার চর্চা সামগ্রিক ভাবে চলতে থাকে প্রশ্নহীন ভাবে, তখনই এই আধুনিকতার প্রতি সন্দেহ, প্রশ্ন

দেখা দিতে পারে, এবং দেখা দেয়ও। আবার উপনিবেশের অন্ত হলেও বহুদিনের অভ্যাস লালিত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার চর্চা চলতে থাকে দীর্ঘদিন। অর্থাৎ 'Postcolonial' বা উপনিবেশোত্তর শব্দগুলি তাদের উন্মেষ পর্ব বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়কে নির্দেশ করে না।

> "What is it that we designate when we refer to a phenomenon as postcolonial? Is the term to be taken literally or chronologically, as referring to that which followed the watershed moment for colonized peoples of independence from colonial rule, usually taken as 1947, the year of Indian independence and the creation of Pakistan? or is it to be more broadly interpreted, as referring to that which questions and protests against colonialism; in which case shouldn't its chronological scope be broadened, projected back in time? On this reckoning, is the pan-Africanist novel Mhudi championing black cultural history, published in 1930 by the founder secretary of the African National Congress, Solomon platje, not a postcolonial text? And what of the poetry written in a characteristically European Romantic mode by the Indian women poets Toru Dutt or Sarojini-Naidu in the late nineteenth and early twentieth centuries – aren't these writers too, even in their oblique refusal to speak of empire at all, postcolonial? ...the postcolonial is that which questions, overturns, and for critically retracts colonial authority – its epistemologies and forms of violence, its claims to superiority. Postcolonialism

therefore refers to those theories, texts political strategies and modes of activism that engage in such questioning, that aim to challenge structural inequalities and bring about social justice."[৭]

এক কথায় উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের কৃত্য যদিও ঔপনিবেশিক সমাজে ঔপনিবেশিক প্রভুদের দ্বারা সৃষ্ট আধুনিকতার সমালোচনা করা, তবুও এর মধ্যে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। M.H. Abrams - এর মত অনুযায়ী উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ –

"The critical analysis of the history, cultural, literature, and modes of discourse that are specific to the former colonies of England, Spain, France and other European, imperial powers. These studies have focused especially on the Third world countries in Africa, Asia, the Caribbean islands, and South America. Some scholars however, extend the scope of such analyses also to the discourse and cultural productions of such countries as Australia, Canada and New Zealand, which achieved independence much earlier than the third world countries. Postcolonial studies sometimes encompass also aspects of British literature in the eighteenth and nineteenth centuries, viewed through a perspective that reveals the extent to which the social and economic life represented in the literature was tacitly under written by colonial exploitation."[৮]

অর্থাৎ উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ একদিকে যেমন আফ্রিকা এশিয়া ক্যারাবিয়ান

দ্বীপপুঞ্জ সহ দক্ষিণ আমেরিকার যে সমস্ত দেশ একদা উপনিবেশ ছিল সেখানকার ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সমালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত আধুনিকতা অন্বেষণের কথা বলে, তেমনি অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, যে দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর থেকে পূর্বে স্বাধীনতা পেয়েছে, তাদের সংস্কৃতিরও বিশ্লেষণ করে, এমনকি ঔপনিবেশিক প্রভুদের দেশেও সৃষ্ট ইতিহাস, সাহিত্য কিভাবে একশ্রেণীর মানুষকে আড়ালে রেখে বিকশিত হয়েছে, তারও সমালোচনা করে। প্রসঙ্গত এডোয়ার্ড সঈদের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে-

> "Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between *the Orient* and (most of the time) *the Occident* Thus a very large mass of writers, among whom are poets, novelists, philosophers, political theorists, economists and imperial administrators, have accepted the basic distinction between east and west as the starting point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions and political accounts concerning the Orient, its people, customs, *mind,* destiny, and so on. This Orientalism can accommodate Aeschylus say, and victor Hugo Dante and Karl Marx. A little later in this introduction I shall deal with the methological problems one encounters in so broadly construed a *field as this*."[৯]

উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী, ঔপনিবেশিক সমাজে পীড়নের সহস্র আয়োজনের মধ্যেও যেমন জেগে উঠতে পারে প্রতিবাদ, তেমনি পরবর্তীতে প্রতিস্পর্ধী চেতনা থেকেই ইতিহাসের পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের দায় হয়ে ওঠে।

"পিছিয়ে পড়া সমাজে উপনিবেশবাদ সবচেয়ে শক্ত শেকলটা পরিয়ে দেয়, কারণ মন যখন স্বেছাবন্দিত্ব মেনে নেয়- আধিপত্যবাদ নিরঙ্কুশভাবে তার জগন্নাথের রথকে চালিয়ে যেতে পারে সর্বস্তরে, উপনিবেশীকৃত মন কখনও আধিপত্যবাদী মহাসন্দর্ভকে প্রশ্ন করতে পারে না, বিকল্প কোনো প্রতিবেদন খোঁজার তো কথাই ওঠে না, জ্ঞান ও প্রতাপের ইতিহাস এবং রাজনীতি টিকে থাকে পরাভূতবর্গের এই বিকল্পহীনতার ওপর। ভাষা চেতনা সংস্কৃতি এককথায় জীবন যাপনে দখলদারি কায়েম করে তাদের ঠেলে দেয় অন্তেবাসীর অবহেলিত অবস্থানে! লোকায়ত সাংস্কৃতিক উপলব্ধি ঐ মহাসন্দর্ভে কিছুমাত্র স্বীকৃতি পায় না এবং উপনিবেশীকৃত মনও নিজের শেকড়কে নিজেই তাচ্ছিল্য করতে শেখে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকেরা একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠমো এত সহজে ভেঙে পড়ে না। উপনিবেশোত্তর সমাজেও সৃষ্টি ও মনন যেসব বুদ্ধিজীবীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, চিত্তবৃত্তি উপনিবেশীকৃত হলে অটুট থেকে যায় আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে তোলার অভ্যাস। চতুর ও সচেতন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এবং বহুবিভাজিত সমাজের অন্তর্বৃত দুর্বলতার সুযোগে যে কেন্দ্রিকৃত মহাসন্দর্ভ অজস্র গুল্ম ছড়িয়ে দিয়েছিল তাকে পরাভূত না করা পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর সমাজে কোনো যথার্থ নতুন সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা জীবনবোধের সূত্রপাত হতে পারে না। গড়ে উঠতে পারে না কোনো নতুন প্রতিবেদন।"[১০]

উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ যদিও অতীত ঐতিহ্যের সাথে সংলগ্নতা স্থাপন করে সংস্কৃতির পুনঃনির্মাণের আকল্প, তার মানে কিন্তু এমন নয় যে, যুক্তি বর্জিত ভাবে অতীত ঐতিহ্যের গুহায় আত্মগোপন করতে চায় উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদীরা কিংবা কোনো কৌম সভ্যতার পুনরুত্থান আজকের উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের কাম্য। ফ্রানৎস ফ্যানন এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"I will not make myself a man of the past ...I am not a prisoner

at history; it is only by going the historical instrumental hypothesis that I will intiate the cycle at my freedom."[১১]

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সংস্কৃতিরই হয়ে ওঠার একটা নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তমান আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিক ভাবে শিল্প সাহিত্যের পরিবর্তন এবং বিকাশ ঘটে। ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের উপনিবেশে উন্নত ভাবাদর্শের নামে যে ভাবাদর্শ প্রচার করে সেই ভাবাদর্শই উপনিবেশের বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং ঔপনিবেশিক প্রভুদের চাপিয়ে দেওয়া এই ভাবাদর্শেরই অনুশীলন চলতে থাকে উপনিবেশের শিল্প সাহিত্য জুড়ে। ফলতঃ যে অতীত থেকে ধারাবাহিকভাবে উপনিবেশের শিল্প সাহিত্য পরিবর্তিত হচ্ছিল, সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটে, অতীত ঐতিহ্যের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ঔপনিবেশিক প্রভুদের চাপিয়ে দেওয়া ভাবাদর্শ ক্রমশঃ মূল ধারার মান্যতা পেয়ে যায়। উপনিবেশের ভাবাদর্শ যেখান থেকে অতীত ঐতিহ্য থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে, উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ সেই বিন্দুটি চিহ্নিত করে ধারাবাহিকতার সূত্র সন্ধান করে ভাবাদর্শের বিবর্তনের স্বাভাবিকতা বজায় রেখে ভাবাদর্শের প্রকৃত বিবর্তনের প্রত্যাশী।

"Postcoloniality may serve as the name of a strategy that repeatedly undoes the seeming opposition."[১২]

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে ক্লিষ্ট উপনিবেশের নিজস্ব আত্মপরিচয় সন্ধানের একটি প্রকল্প হল উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ। Frantz Fanon আফ্রিকার পটভূমিতে যে 'Cultural resistance' এর কথা বলেছেন তা আসলে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

"Fanon argued that the first step for colonialised people in finding a voice and an identity is to reclaim their own past.

For centuries the European colonising power will have devalued the nation's past, seeing its precolonial era as a pre-civilised limbo, or even as historical void. Children both black and white, will have been thught to see history, culture and progress as begining with the arrival of the Europeans. If the first step towards a postcolonial perspective is to reclaim one's own past, then the second is to beging to erode the colonialist ideology by which that past had been devalued."[১৩]

তবে উপনিবেশোত্তর কৃৎকৌশল, শুধুমাত্র শিল্পী সাহিত্যিকদের জন্যই নয়, তা পাঠকদের জন্যও, পাঠকেরও দায় হয়ে পড়ে পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজে এককেন্দ্রিক ভাবাদর্শের প্রতিস্পর্ধী স্বর আবিষ্কার করা এবং পাঠকৃতির নিয়ন্ত্রা প্রতাপের চরিত্র চিহ্নিত করা, সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -

"নতুন চেতনায় পাঠকের দায়ও আজ বেড়ে গেছে অনেকখানি, সমাজে যাঁরা ধারাবাহিকভাবে নিপীড়িত কীভাবে পাঠকৃতিতেও তাদের প্রান্তিকায়িত হতে হয়েছে এইটি লক্ষ্য করে তিনি নিজস্ব পাঠপ্রকরণকে কৃৎকৌশল হিসেবে তৈরি করুন। কেন্দ্রায়িত সন্দর্ভ যেহেতু সত্যভ্রম আড়াল করে রাখে প্রকৃত সত্যকে - - তাকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আগে ফাঁপা ইমারত বা মিথ্যার স্থাপত্যকে চিনে নিতে হবে, তিনি দেখবেন কীভাবে কথাবীজ, ভাববীজ বাচন বা ভাষাবিন্যাস আঙ্গিক বা আকরণ, পরিসর বা প্রেক্ষিত কালিক মাত্রা বা স্থানিক আয়তন প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বময় সামাজিক ইতিহাস নিয়ন্তা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি লক্ষ্য করবেন, ইতিহাসের পাঠ যাদের বীক্ষণবিন্দু থেকে তৈরি হচ্ছে তারাই ঠিক করে দিছে নান্দনিক প্রত্যয় ও অভিব্যক্তির সার্থকতা ও অসার্থকতা, পাঠক

যখন বিনির্মাণ করবেন, তাঁকে এই বড়ো বাধা পেরিয়ে যেতে হবে আগে। পাঠকৃতির মধ্যেই কীভাবে প্রায় নিরুচ্চারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে বিপ্রতীপ কণ্ঠস্বর কিংবা অনুপস্থিতের মধ্যে সম্ভাবনাময় কোনো উপস্থিতি, এইটি বোঝার জন্য প্রতিবেদনে চিহ্নায়কের বা সংকেতের পরম্পরাকে ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করবেন তিনি, যা প্রতীয়মান তার প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা না দেখিয়ে সম্ভাবনার আশ্রয় হিসেবে অর্থাৎ পাঠকের নিজস্ব সন্দর্ভে পৌছানোর জন্য কবি লেখক উত্থাপিত জরুরি আদি পাঠ হিসেবে ঐ প্রতীয়মানকে গ্রহণ করবেন। বলাভালো সমস্ত আরোপিত উপস্থিতির অন্তরালে থাকা সম্ভাব্য এক গভীরতর সত্যের সাংকেতিক গ্রন্থনায় পৌছানো উপনিবেশোত্তর চেতনার অভিপ্রেত এবং পাঠকের অপরিহার্য কৃত্য, বারবারা জনসনের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে – The deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion, but by the careful teasing out of warring forces of signification within the text itself."[১৪]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর প্রচারিত ভাবাদর্শকে একমাত্রিক ভাবে গ্রহণ করার ফলে শোষিত দেশে তার নিজস্ব ঐতিহ্যথেকে সম্পর্কচ্ছিন্ন বিজাতীয় শিল্প-সাহিত্য গড়ে উঠলেও এবং তা মূল ধারার (Mainstrem) মান্যতা পেলেও শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের হয়ে থাকায় এবং শোষিত ভূখন্ডে কোনো দৃঢ় জাতীয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে না ওঠার জন্য এই উল্লম্ফ (Jumping) ও নিরালম্ব আধুনিকতার মধ্যে অজস্র পিছুটানও অনিবার্যভাবেই রয়ে যায়, যা জন্ম দেয় স্ববিরোধিতার। উপনিবেশোত্তর চেতনানিষ্পন্ন দৃষ্টিতে এই স্ববিরোধিতার প্রকৃত চেহারা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রচারিত ভাবাদর্শের আদলে গড়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্য যে বিন্দু থেকে ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করে গড়ে ওঠে, বিচ্ছেদের সেই বিন্দুটিও চিহ্নিত হয়ে যায়।

দেশজ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিকশিত হয়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্য উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের অভীষ্ট। বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রতিস্রোতের চরিত্র ও অভিব্যক্তি ভিন্ন হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই উক্ষ্যে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কসূত্র পুনরাবিষ্কার। কেননা "ঔপনিবেশিক আগ্রাসন যেহেতু উপনিবেশীকৃত দেশে ধারাবাহিকতাকে ছিন্ন করেই শাসিতের আত্মমর্যাদা, শক্তি ও সচেতনতার উৎসকে শুকিয়ে দিতে চায় - এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রথম শর্ত সর্বত্রই এক ঃ জল দাও আমার শিকড়ে! আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটানোর জন্য আবশ্যিক এই সংযোগ সেতুর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এই জরুরি প্রাথমিক কাজটুকু করার পরেই কেবলমাত্র শুরু হতে পারে সাম্প্রতিকের তাৎপর্য নির্ণয়। হেগেলের প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ ঃ আমাদের সত্তার নির্যাস হলো আমরা কী ছিলাম সম্ভবত এভাবেই সার্থক হয়ে ওঠে।" [১৫]

২.২.২ - বাংলায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ঃ একটি উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী বিশ্লেষণ ঃ-

ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে যে আধুনিকতা বাংলায় এসেছিল তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বহুক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা ব্যর্থতা ছিল। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি বিচার করে বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে বাংলার রেনেসাঁর প্রাপ্তি অসংগতি ও অসম্পূর্ণতার একটি সামগ্রিক ছবি ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণাকর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, এমন যে চারটি বিষয়ের উপর আমরা অধ্যায়ের এই অংশটিতে আলোকপাত করব সেগুলি হল -

এক ঃ-নবজাগরণ বা দীপায়নের ছোঁয়া লেগেছিল মুষ্ঠিমেয় কিছু ইংরেজী শিক্ষিতজনের মধ্যে। বৃহত্তর জনসমাজকে তা স্পর্শ করতে পারে নি।

দুই ঃ- কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে না ওঠার জন্য শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যদিয়ে প্রাপ্ত এই আধুনিকতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

তিন ঃ- মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেণী প্রতীচ্যকে একমাত্র শরণ্যবলে ভাবায় তাদের সৃষ্ট সাহিত্যও

ঐতিহ্য সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

চার ঃ- আধুনিকতার অসম্পূর্ণতার দিকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন।

উনিশ শতকে কোলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে যে আধুনিকতার সূত্রপাত এদেশে ঘটে, তার প্রেক্ষাপট রূপে আর্থ-সামাজিক কোনো বিরাট পরিবর্তন কাজ করে নি, বরং তা এসেছিল ইংরাজি শিক্ষার হাত ধরে। শিল্পায়নের অভিঘাতে যেভাবে আধুনিক নগর এবং সেই নগরের অধিবাসী একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, কোলকাতা শহর এবং সেই শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের পেছনে এরকম শিল্পায়নের কোনো প্রভাব ছিল না। কোলকাতার আর্থিক কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রিক ছিল। ঐতিহাসিক পোলার্ড (A.F. Pollard) আধুনিক যুগে নগর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে লিখেছেন –

> "Feudalism contemplated, roughly only two classes, the lords and their villeins. Now, the industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide; it requires a middle class and it requires and urban population. Without these two there would have been little to distinguish between modern and medieval history. Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no reformation."[১৬]

পোলার্ডের এই মন্তব্য থেকে রেনেসাঁ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নগরায়ন ও শিল্পায়নের পারস্পরিক কার্য-কারণ সম্পর্কটি বোঝা যায়। অথচ আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নগর গড়ে ওঠার পেছনে শিল্পায়নের প্রভাব ছিল না। ঐতিহাসিকভাবে নবজাগরণের প্রেরণা এদেশে সঞ্চারিত

হয়েছিল মূলত ইংরাজি শিক্ষার সাহায্যে অর্জিত কিছু ইউরোপীয় মূল্যবোধের সাথে পরিচয়ের সূত্রে। কোলকাতা শহরও গড়ে উঠেছে মূলত বাণিজ্য ও প্রশাসনের কেন্দ্র রূপে, যেখানে অনেক চাকরির (Service) পদ সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পায়নসৃষ্ট শহরে চাকরির যে বাজার তৈরি হয় তা শিল্পায়নের গতির 'over-head' হিসেবে গড়ে ওঠে, অপরদিকে কোলকাতা শহরের চাকরির বাজার ঔপনিবেশিক প্রভুদের কর্মক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থনীতিবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ভাষায় "ঔপনিবেশিক ধারার নগরীকরণের আরেকটা চিহ্ন হল শিল্পায়ন বিনা নগরীকরণ, যেটা পাশ্চাত্যের ধারার ঠিক বিপরীত। নতুন মহানগরগুলি গড়ে উঠল বাণিজ্য ও প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে ....।"[১৭]

অর্থাৎ আমাদের আধুনিকতার পেছনে শিল্পায়নের কোনো প্রভাব ছিল না। উপরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন জমিদারশ্রেণীর স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বজায় থাকার ফলে মধ্যযুগের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের পাশ্চাত্যজ্ঞানলব্ধ যুক্তিবোধ, কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে না ওঠার জন্য যার ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং অধিকাংশ মানুষের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ – এই দুয়ের সহাবস্থানে যে আধুনিকতার সূচনা এদেশে হল তার প্রকৃত স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল 'বকচ্ছপ' ধরনের। আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় বিনয় ঘোষের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে –

> "মূল অর্থনৈতিক ভিত্তির যদি বিশেষ পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই পুরাতন ভিত্তির উপরে গঠিত সামাজিক সংস্থা বা ইন্‌স্টিটিউশনগুলির অথবা সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণাগুলির স্থায়ী পরিবর্তন হয় না, বহিরাগত ভাবসংঘাতের ফলে একটা সঞ্চরণশীল পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এইদিক থেকে বিচার করলে, typo-logically উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোড়নকে 'রেনেসাঁস' বললে ভুল হয় না, কিন্তু বৈদেশিক শাসনাধীনে সংঘটিত এই জারজ রেনেসাঁস-

এর সঙ্গে পাশ্চাত্য রেনেসাঁস-এর প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু তার বাস্তব পশ্চাদ্‌ভূমি না থাকার জন্য শেষপর্যন্ত তার সামাজিক ফলাফলও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষময় হয়েছে। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি বিচার করে বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে আমরা তার অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা আরও ভাল করে বুঝতে পারব।"[১৮]

নবজাগরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কুলবৃত্তিগত বন্ধন শিথিল করা, তা উনিশ শতকে সচল টাকার অভিঘাতে ভাঙলেও এই কুলবৃত্তিগত মূল্যবোধ যৌথনিশ্চেতনায় রয়ে গেছে। গ্রাম্যসমাজের মতো কুলবৃত্তিকেন্দ্রিক (Caste-Occupational) সমাজের রূপ কোলকাতার দৈহিক গড়নের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। কুমোরটুলি, কলুটোলা, শাখারীটোলা, গোয়ালটুলি, ডোমটুলি, কাঁসারীপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের নামের মধ্যে বৃত্তিভিত্তিক বসতিবিন্যাসের রূপটি সহজেই চোখে পড়ে। অর্থাৎ উনিশ শতকে নবলব্ধ যুক্তিবোধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ পরিবর্তিত সমাজভূমি থেকে উৎসারিত হয় নি, তা এসেছে নিতান্তই পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে পদে পদে আপোষ করে গড়ে ওঠা এই আধুনিকতা তাই একদিকে যেমন ছিল জন্মসূত্রে পঙ্গু, তেমনি পাশ্চাত্যের কেতাবি বুদ্ধিসর্বস্ব মন প্রতীচ্যকেই সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একমাত্র শরণ্য বলে গ্রহণ করায় দেশজ ঐতিহ্য তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। উপরন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মানুষের চেতনায় আধুনিকতার যুক্তিবোধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আলোড়ন তুললেও বৃহত্তর জনসমাজকে যেহেতু তা স্পর্শ করতে পারে নি, এর কুফলস্বরূপ শিক্ষিত এলিটশ্রেণী ক্রমশঃ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

আধুনিকতার সবচেয়ে বড় শর্ত হল সামন্ততন্ত্রের শেকল ভাঙা, সেটা আমাদের দেশে একেবারেই হয় নি। ফলতঃ সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য – বিনা প্রশ্নে প্রথানুগত্য , বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গ বিভাজিত সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিকতা, মানবিক বৃত্তিকে ধর্ম ও পারত্রিক ধারণার বশীভূত ভাবা,

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে স্থিতাবস্থার প্রতি সমর্থন – প্রভৃতির সক্রিয় উপস্থিতিতে যে আধুনিকতা আমরা লালন করেছি তা ছিল প্রবল স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লবের যে আবশ্যস্কাবী ফলস্বরূপ আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল, আমাদের দেশে সৃষ্ট আধুনিকতার পেছনে শিল্পায়নের এমন কোনো পশ্চাদপট ছিল না। [১৯] ব্রটিশ প্রভুরা এদেশে শিল্পায়ন চান নি । প্রসঙ্গতঃ Michael Kidron এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে -

> "From the 1850's public works were financed out of current revenues sparingly; requests subsidies for heavy industry were repeatedly denied; several attempts to set up investment banks were blocked and field left clear for orthodox British banking which was then, as now, totally unsuited for the purpose. Rail-ways converged on the ports with little regard for internal economic logic and none for uniformity of gauges and rates. Railways building had little spread effect:Permission to buy government Stores in India come only in 1928 and preference for local manufactures in 1931 Recommen - dations of the Famine Enquiry Commission; 1880 to encourage industry and sponsor technical training officially were ignored for nearly forty years." [২০]

ভারতে শিল্পায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল "সাধারণভাবে কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতিকে শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডের পরিপূরক হিসেবে তৈরি করার ইংরেজ প্রবণতা।"[২১] নতুন শিল্প স্থাপন তো দূরস্ত বরং দেশীয় শিল্পকেও ব্রিটিশ শক্তি ধ্বংস করতে চেয়েছে। "উনবিংশ শতাব্দীতে কয়লাখনি রেলপথ চাবাগান পাটকল কাপড়ের কল ইত্যাদি বেশি তৈরি হয় এবং সর্বক্ষেত্রে ব্রিটিশ মূলধনই নিযুক্ত হয়।"[২২] ১৯০০ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি N.G.

Chandavarkar ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে জাতীয় শিল্পগুলি রক্ষা করার দাবী উত্থাপন করে বলেছেন "The excise duty levied on the Bombay mill industry clearly shows that under the present policy, no Indian industry will be allowed to outgrow European competition."[২৩]

উপরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু দিকটিও বজায় থেকেছিল। প্রসঙ্গত বিনয় ঘোষের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে –

> "সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের এই অবাঞ্ছিত পরিণয়ের সামাজিক ফলাফল হয়েছে ভয়ানক শোচনীয় । এদেশের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অনেক উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা নতুন নগরমুখী জনজোয়ারের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়েছে ... যারা তখন কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল, তাঁরা বেনিয়ানি মুচ্ছুস্কিগিরি ব্যবসা-বানিজ্য যাই করুন না কেন তাতেই কমবেশী কৃতকার্য হয়েছিল এবং ধন-দৌলতের অধিকাংশ হয় সামন্তসুলভ প্রমোদমত্ততায় অথবা জমিদার হবার বাসনা চরিতার্থের জন্য ব্যয় করেছেন। সামন্তযুগের প্রেতাত্মা তাঁদের সকলের স্কন্ধে ভর করেছে। তাঁরাই হয়েছেন নতুন কলকাতা শহরে আদিপর্বের অভিজাত শ্রেণী ।... যাবতীয় বিধি নিষেধ সংস্কার কু-সংস্কার টোটেম ট্যাবু ইত্যাদি নিয়ে মধ্য যুগের সমাজ কলকাতা শহরে আঠের শতকে সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। ... অর্থনীতি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাণিজ্যিক বাধা বিপত্তি সামান্য কিছুটা অপসারিত হলেও অধুনিক শিল্পায়নের কাজ আরস্ক হয়নি। বিজ্ঞানের আলো সমাজের ও মনের বন্ধ জানালা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে নি। কলকাতার মন পুরোদস্তুর তখন মধ্যযুগের অন্ধকারে বন্দি।"[২৪]

এবং

> "উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা যায় কলকাতা শহরের রাস্তায় দু-একটি

পোষা হাতিও চোলে বেড়াতো। হাতি হল ফিউডাল যুগের দীর্ঘস্থায়ী Symbol এবং কলকাতা শহরে তখনও হাতি ছিল যথেষ্ট কারণ কলকাতার নাগরিক সমাজে তখনো ফিউডাল সমাজের প্রভাব ছিল ব্যাপক। হাতি তারই প্রতিভূ রূপে ঘুরে বেড়াত কলকাতার পথে। সামন্তযুগের পথিক গজমূর্তি স্বাভাবতই নতুন যুগের ঘোড়াকে সন্ত্রস্ত করত। ”[২৫]

নেপাল মজুমদার এই আধুনিকতার মধ্যে দেখেছেন প্রাণের দুর্বলতার লক্ষণ।

“আমাদের দেশের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ অত্যন্ত কৃশপ্রাণ এবং তাহা অগ্রসর হইয়াছে অত্যন্ত ক্ষীণ ধারায়। কিন্তু ইউরোপের নবজাগরণ অর্থাৎ রেনেসাঁস সর্বপ্রসারী ও একটি সর্বাত্মক বিপ্লব।... বলাবাহুল্য, ইহার কারণ ইউরোপের বিশেষ সমাজ অর্থনীতিক ব্যবস্থা। মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও তামসিকতার গর্ভ হইতে আধুনিক ইউরোপের যে বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, সেই বিপ্লবের প্রেরণা আসিয়াছে তাহার আপন সমাজের গর্ভ হইতে। পক্ষান্তরে আমাদের নবজাগরণের প্রেরণা আমাদের বাস্তব সমাজ ব্যবস্থা হইতে যতখানি না আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও অধিক আসিয়াছে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের রসাস্বাদনের ফলে, এবং তাহাও প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন উপলক্ষে আমদানি করিয়া।.... ইংরেজ তাহার সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রের নিষ্পেষণে জাতীয় শিল্প অথবা আমাদের বুর্জোয়াদের কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে দেয় নাই। বস্তুতপক্ষে, উনিশ শতকের মধ্যভাগেই আমাদের দেশে ব্রিটিশ পুঁজির মাধ্যমেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন হয়। সেই কারণেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কোনো দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ না থাকার জন্যই আমাদের রেনেসাঁস এতো কৃশপ্রাণ, ক্ষীণ ও দুর্বল। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজ ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানগুলির দালালী কিংবা মুৎসুস্কীগিরি অথবা সরকারী চাকরি করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর দেশে যে নূতন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ বুদ্ধিজীবী মুৎসুস্কী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে।... অর্থাৎ আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত অতি গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল।... তাই তাঁহাদের জীবনদর্শনে ও আচরণে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ, সংস্কারবাদ ও বিপ্লববাদের এত তাত্ত্বিক গোঁজামিল; তাই তাঁহাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে এতখানি দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়তা ও স্ববিরোধিতা।"[২৬]

এই 'তাত্ত্বিক গোঁজামিল' কালক্রমে আমাদের স্বদেশী চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। সুশোভন সরকার বাংলার রেনেসাঁসের 'একটি নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য' স্বীকার করে নিলেও এর আভ্যন্তরিণ দুর্বলতাকেও অস্বীকার করতে পারেন নি।

"বহুমুখী অগ্রগতির যে প্রচণ্ড গতিবেগ আর উদ্যমের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস, সেই গতিবেগ আর উদ্যম বাংলার রেনেসাঁসের ছিল না। একটি বিদেশি আধা-ঔপনিবেশিক শাসনের বাঁধাবাঁধনের আওতার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল আমাদের আন্দোলন। এক জীবনদায়ী প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগটুকু পর্যন্ত জোটেনি আমাদের রেনেসাঁসের। বরং তার প্রাথমিক প্রকাশগুলিকে বহুলাংশেই নির্ভর করতে হয়েছে এক বিজয়ী বৈদেশিক শক্তির ওপর।"[২৭]

উপরন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষালস্ক এই রেনেসাঁর যুক্তিবোধ সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজিশিক্ষিতকে প্রভাবিত করেছিল, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। "বাংলার এই নতুন জীবন আবদ্ধ থেকেছে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চস্তরে, অর্থাৎ 'ভদ্রলোক'দের মধ্যেই; মুসলমানরা এবং পিছিয়েথাকা ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুরা এই জীবনের শরিক হতে পারেনি।"[২৮]

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি যে নিজেদের প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্যই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পত্তন করে, তা প্রাথমিক তৃপ্তির উচ্ছাসে কেউই ভেবে দেখেননি। মেকলে তাঁর শিক্ষানীতির লক্ষ্য সম্পর্কে জানিয়েছিলেন যে তিনি চান এমন একশ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলতে

> "Who may be interpreters between us and the millions whom we Govern - A class of persons Indian in colour in blood, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."[২৯]

রক্ত ও চামড়ার পরিচয়ে ভারতীয় হলেও রুচি, মতাদর্শ, নীতি ও প্রজ্ঞায় ইংরেজ হবেন এমন 'হাঁসজারু' ধরনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি ছিল মেকলের স্বপ্ন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বুদ্ধিমার্গীয় দৃষ্টিতে যারা ইংরেজের পোষ্যপুত্র, তাদের উৎপত্তি ও বিকাশ হওয়ায় সাংস্কৃতিক চেতনার স্তরে ছিন্নমূল মানসিকতাই পুষ্ট হয়েছে। অবশ্য এদেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীকে রুচির দিক থেকে ইংরেজের পোষ্যপুত্র বানানোর পেছনে বাজার অর্থনীতির উদ্দেশ্যও ছিল। ১৮১৩ সালে সরকারী আদেশ বলে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং ভারতের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হয়। ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদা এদেশীয়দের মধ্যে তৈরি করতে গেলে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যদিয়ে পাশ্চাত্য রুচি তৈরি হবে এবং এই পরিবর্তিত রুচি ব্রিটিশ পণ্যের বিস্তৃত বাজার তৈরি করবে - এরকম একটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও প্রতীচ্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। "ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হলে ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে এবং তারা তখন ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে চাহিদা বোধ করবে। ইংরেজ সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা ইংরেজ জীবনযাত্রাকে অনুসরণ করবে এবং সেই পথেই প্রবেশ করবে ব্রিটিশ পণ্য।"[৩০] বস্তুত ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র হিসেবে ব্রিটিশ শক্তি কাজ করেছে, ধীরে ধীরে গ্রামে-গাঁথা দেশের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়েছে ওরা। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিছিন্নতা ক্রমশঃ দূর হয়ে গেছে; কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো নতুনভাবে গড়ে

না ওঠার ফলে সামাজিক অস্থিরতা বিষাক্ত কীটের দংশনে চেতনাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এরই মধ্যে মুৎসুদ্দিদের আবির্ভাব হয়েছে- যারা বৈষয়িক সমৃদ্ধির লোভে ব্রিটিশ প্রভুর বশংবদ হয়ে গেছে। সামন্তরাজাদের সামরিক পরাজয়ের ফলে শাসন ক্ষমতা খিরকি দুয়ার দিয়ে ব্রিটিশ বণিকের কাছে চলে এসেছিল। অবক্ষয়ী সমাজ ধ্বংসপ্রায় হয়ে গেলেও ব্রিটিশ শক্তি এই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত তো করেইনি, বরং সুচতুর স্বার্থবুদ্ধিকে জিইয়ে রেখেছ। তাই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পত্তন করে ইংরেজ বিনাশোন্মুখ সমাজ ব্যবস্থাকে কৃত্রিমভাবে দীর্ঘায়িত করেছে। নতুন পরগাছা শ্রেণী ও মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের বিকৃত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রগুলিকে প্রসারিত করেছে আরো। বুদ্ধিমার্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যারা 'ইংরেজের সন্তান', নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উৎপত্তি ও বিকাশ হওয়াতে সাংস্কৃতিক চেতনার স্তরে ছিন্নমূল মানসিকতাই শক্তি অর্জন করেছে। প্রসঙ্গত আমরা বিখ্যাত চিন্তাবিদ জাঁ পল সার্ত্র-র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি ঃ "The European elite undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents : they branded them, as with a red-hot iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high-sounding phrases, grand glutinous words that stuck to the teeth."[৩১]

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশের নব্য শিক্ষিত শ্রেণী ইউরোপীয় জীবনাচরণকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতেগিয়ে নিজেদেরকে নিজেদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। সাহিত্য-শিল্প সহ জীবনাচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এঁরা ইউরোপীয় মডেলকেই একমাত্র শরণ্য বলে ভেবেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে তৈরি হওয়া সাহিত্যও তাই অনিবার্যভাবেই ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরালম্ব হয়ে পড়েছে। এই দিকটি লক্ষ্য করে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন –

"আমাদের ব্যক্তিত্ব বিদেশী টবে গঠিত হয়েছে, না ঠিক টবেও না, অর্কিডের

মধ্যে। আমাদের পৌরুষ বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তিত্ব, আমাদের জাতি ও জীবনের কর্মপ্রবাহে, আমাদের পিতৃপুরুষের সনাতন ঐতিহ্যে এর কোনই শিকড় নেই।... আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে তা আমাদের মন, আমাদের হৃদয়, আমাদের আত্মা, আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের পৌরুষকে আমাদের জাতীয় জীবন থেকে রেখেছে বিচ্ছিন্ন করে।''[৩২]

ঔপনিবেশিক সমাজে শিক্ষিত সমাজের ইংরাজী মোহ কতখানি প্রবল ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় ড° ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় –

''পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় মানসকে চিন্তার দিক দিয়ে জয় করে ফেলেছিল। ভারতের অতীতাশ্রয়ী যে কোনো জিনিসই তখন ছিল পরিহার্য। ভারতীয় জনমানসের এই বিভ্রান্ত সনাতনবাদী সাহিত্যিকরাই তাঁদের রচনার মাধ্যমে মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে করলেন সহায়তা।''[৩৩]

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এই বিষয়টিকে বলেছেন 'সাংস্কৃতিক পরাধীনতা' 'মননে স্বরাজ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন -

''সাংস্কৃতিক পরাধীনতা একমাত্র তখনই হয় যখন নিজের ঐতিহ্যগত ভাবধারা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি চাপা পড়ে যায় তুলনামূল বিচার অথবা প্রতিযোগিতা ছাড়াই এবং একটা বিজাতীয় সংস্কৃতির নতুন পরিমণ্ডল ব্যক্তিকে ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসে। এই পরাধীনতাই হল চেতনার দাসত্ব, যা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হতে পারলে মনে হয় চোখের উপরথেকে একটা আবরণ যেন সরে গেল। ... আমাদের শিক্ষা এতকাল আমাদের নিজেদের নিজেকে চেনার কাজে কোনো সাহায্য করেনি, নিজেদের অতীতের তাৎপর্য, বর্তমানের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যকে জানতে দেয়নি। এই শিক্ষা আমাদের আসল মনকে অচেতনতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তার বদলে এক ছায়া-মনের প্রতিস্থাপনা করেছে যার মূল অতীত বাস্তব বর্তমানের মধ্যে প্রবিষ্ট নয়। আমাদের চিরায়ত মন

কখনো সম্পূর্ণভাবে মাটির তলায় চাপা পড়েনি এবং এর বিকল্পে যাকে স্থাপন করা হয়েছে তাও সার্থকভাবে কার্যকর ও সৃষ্টিশীল হতে পারেনি। এই পরিনতিতে সৃষ্টি হয়েছে দুটি মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নৈরাশ্যজনক এক অর্থহীন কলরব। আমাদের চিন্তা তাই পুরোমাত্রায় খিচুড়ি চিন্তা এবং তা অনিবার্য্যরূপ বন্ধ্যা। দাসত্ব প্রবেশ করেছে আমাদের অন্তরাত্মায়।"[৩৪]

আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতা কতটা প্রবল ছিল তা বোঝা যায় দেবেশ রায়ের বক্তব্য থেকে -

"যেন বাংলায় মেঘনাদবধ কাব্য রচনাটিই এক বিদেশী কার্য্যসূচী আর তাই সেই কার্য্যসূচীর বিবরণ কবিকে জানাতে হচ্ছে তার মাতৃভাষা ইংরাজিতে, যদিও তিনি বলেন ... I have the Grand mythology of our ancestors, it is full of poetry কিন্তু এতকিছু সত্বেও কবি হিসেবে তিনি চান ... try to write as a Greek would have done মধুসূদন বাংলা আধুনিকতার সেই প্রয়োজনীয় গ্রীক অথবা ইংরেজের ভূমিকায় নিজেকে দেখেন । ভারতীয় সংস্কৃত কবিতা তাঁকে বিষয় দেবে, কিন্তু তিনি লিখবেন বিদেশীর মত । আর সেই অ ভারতীয়তার জন্যেই তিনি আমাদের প্রথম আধুনিক কবি ।"[৩৫]

ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী লোকজ উপাদানকে কতটা হীন নজরে দেখত তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিজ্ঞতা থেকে। মৈমনসিংহ গীতিকা সংক্রান্ত তথ্য অন্বেষণ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন –

"কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ছোটলোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, ঐ সকল মাথামুণ্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের ওপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন? আপনি এই

ছেঁড়া পুঁথি ঘাঁটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।”[৩৬]

প্রতীচ্যকে নির্বিচারে গ্রহণের মানসিকতা সে-দিনের ইয়ংবেঙ্গলের যুবকদের মধ্যে কতটা প্রবল ছিল, তা বোঝা যায় ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী লর্ড মেকলের মন্তব্য সমর্থন করার ক্ষেত্রে। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই মন্তব্যের এক স্থানে মেকলে লিখেছিলেন –

> “I am quite ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalists themselves. I have never found one among them, who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.”[৩৭]

অতঃপর গ্রন্থকার লিখেছেন “এক সেল্‌ফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই - এই কথাটা প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের গাত্রে তপ্ত জলের ছড়ার ন্যায় পড়িল। তাঁহারা ক্ষেপিয়া আগুন হইয়া গেলেন। ... এদেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের রাজ্য আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। ... তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth’s Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।”[৩৮]

উপনিবেশোওর চেতনাবাদ এই বিচ্ছিন্নতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার

মধ্যদিয়ে সময়ের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী। তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় –

> "উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী এবং বিনির্মানপন্থী। জীবনে-সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরনের আধিপত্য প্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে, তাদের বিপ্রতীপে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে নৈঃশব্দ্যের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করে তোলা এর প্রধান লক্ষ্য। তাই একই সঙ্গে প্রচলিত ধারণাগুলির বিনির্মাণ ও পুনঃপাঠ করার উপযোগী কৃৎকৌশল আবিষ্কার করাও তার কৃত্য ।"[৩৯]

২.২.২.১. চেতনার দাসত্বের দিনে রবীন্দ্রনাথ -

রবীন্দ্র উপন্যাসের সচেতন পাঠে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নিরালম্ব দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় । ঔপনিবেশিক আধুনিকতার এই অসম্পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের সীমাবদ্ধতা যে উপনিবেশের প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন -

> "আমরা বঙ্গসমাজ নামক যে মাকড়সার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে মতামত নামক আসমানগামী ডানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে । ডানা আস্স্কালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোনো সুবিধা হইতেছে না।"[৪০]

একদিকে ঔপনিবেশিক অসম্পূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত স্বল্প সংখ্যক মানুষ অপরদিকে বিশাল সংখ্যক সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাসে অভ্যস্ত জনসমাজ এই দুয়ের টানা পোড়েনে সৃষ্ট সমাজের কিস্কুতকিমাকার চেহারাটি রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করেছিলেন –

> "প্রাচীনকালে স্ত্রী-পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূন্যাধিক্য ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষার সাম্যও ছিল।... সমাজসমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উচু নিচু অবশ্যই ছিল, কিন্তু তেলেজলের মত একটা পদার্থ ছিল না।... আমাদের দেশে

ইংরেজি শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে, অর্থাৎ বাপে বেটায়, একপ্রকার জাতিভেদ হইয়াছে । যেখানে জাতিভেদ আছে অথচ নাই, সেখানে কোনো কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। ... আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না; তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দু সমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বলপূর্বক পাকানো হইতেছে। ইহার একটা আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই পাক ধরে, গাছে পাঁচদিনে যাহা হয় এই উপায়ে এক দিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজের তাহাই হইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজি সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না। এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আর খাটে না।"[৪১]

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার হাত ধরে পাশ্চাত্য ভাবধারার আক্রমণ সেদিন কতটা প্রবল ও সর্বগ্রাসী ছিল তা রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন এর বিষময় ভবিষ্যত-

"বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ় - তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকান বাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে।"[৪২]

এই সর্বগ্রাসী প্রতীচ্যীকরণের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে –

"আজ আমরা ইহা উত্তম রূপে বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া

থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে।... আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় - আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবল ভাবে, সচল ভাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠা।"[৪৩]

নিজেদের সজ্ঞানে সচেতনভাবে সচলভাবে সম্পূর্ণ নিজেদের মত করে গড়ে তোলার আর্তি উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের মূল কথা, বিদেশী শিক্ষা বিদেশী সভ্যতা যখন আমাদের মনকে অভিভূত করে আমাদের নিজস্ব লোকায়ত ভাবধারাকে অস্বীকার করতে শেখায় তখনই দেখা দেয় মননের পরাধীনতা –

"প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক, বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কী করিয়া?"[৪৪]

আমাদের চেতনা জাগ্রত না থাকার জন্যই যে এমনটা ঘটছে তা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন চেতনার জাগরণ, যেটা সম্ভব হবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে নিজস্ব ঐতিহ্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে।

ভাবতে অবাক লাগে সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা আজকের এই অন্ধ শতছিন্ন সময়েও কত অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। সেদিনের আমাদের দুরবস্থার পেছনে ছিল আমাদের আলস্য, স্বদেশের বিষয়ে কিছু জানার ক্ষেত্রে অনীহা জনিত আলস্য, এই সুযোগে ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাঁদের মত করে আমাদের ভাষা সমাজ-সংস্কৃতি ইতিহাসকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের দেখিয়েছিলেন।

> ‘‘আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি- আলস্য পূর্বক তাহাও লইনা, দেশের ইতিহাস ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই, ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলে হান্টার বৈ গতি নাই।’’[৪৫]

এই দৈন্যতা মোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আহ্বান করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আহূত সভায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দেশীয় বিষয়কেও পাশ্চাত্য মডেলের অনুকরণে দেখার যে দুর্বলতা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার দীর্ঘদিন লালিত অভ্যাস তার বিপরীতে গিয়ে দেশের শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস আমাদের মত করে দেখার এবং লেখার কাজে তিনি ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন ইউরোপীয় মডেল অনুসরণের প্রবণতা ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় কতটা প্রবল ছিল, তার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> ‘‘তখনো ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতি লাভ করিবার আকাঙ্খা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল, এমন কি যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজি মাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিলনা - তখন কেহ বা বাংলার মিল্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন, কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন - এমন কি বাংলার অভিনেতাকে সন্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত।’’[৪৬]

কিন্তু কেন এমনটা হল, কেন ঔপনিবেশিক আধুনিকতা জন্মমুহূর্ত থেকেই দেশীয় ঐতিহ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি সীমাহীন অজ্ঞতা এবং অজ্ঞতাজনিত অবজ্ঞা। পাশ্চাত্য শিক্ষার চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রসঙ্গগুলি লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গগুলি

আমাদের দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গিয়েছিল।

> "বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ... দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল - কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।"[৪৭]

মনে পড়ে মেকলের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য, আর এই শিক্ষানীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঐতিহ্যের প্রতি অনাগ্রহী শিক্ষিত শ্রেণী, যাদের হাত ধরে আসা আধুনিকতাও তাই অনিবার্যভাবে হয়ে পড়েছে নিরালম্ব। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা যেদিন দেশহিতৈষণার কাজে উদ্যমী হয়েছিলাম সেদিন তাই দেশকে স্বদেশের মূর্তিতে উপলব্ধি করতে পারিনি, সেই দেখাও ছিল অসম্পূর্ণ –

> "আমাদের প্রথম বয়েসে ভারতমাতা ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দূরে থাকুক, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখিনাই।"[৪৮]

এর কারণ যে দেশকে দূরে রেখে দেশের প্রতি দীর্ঘ লালিত বিতৃষ্ণা নিয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা তা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি –

> "আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবলডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়টিজমের ভাব রস সম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম, মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয় আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান

করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম, দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশী রাজদরবারকেই দেশহিতৈষীতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম।"[৪৯]

এ-ধরনের উদ্ধৃতি রবীন্দ্র সাহিত্যে অপ্রতুল নয়, যার মধ্যদিয়ে আমরা অন্তত এটুকু লক্ষ্য করতে পারি, ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে সৃষ্ট নিরালম্ব আধুনিকতা ও সেদিনের প্রবল প্রতীচ্য মোহ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্যাস লেখেন, তখন তাঁর উপন্যাসে এর অভিঘাত পড়া স্বাভাবিক। বিশেষত তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী যেহেতু প্রাশ্চাত্য শিক্ষাপুষ্ট আলোকপ্রাপ্তবর্গ। রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল সীমাবদ্ধ আধুনিকতার বিচিত্র উপস্থিতি সচেতন পাঠে উপন্যাসগুলির ভিন্ন তাৎপর্যের সন্ধান দিতে পারে।

২.৩.১ - নারীচেতনাবাদী পাঠকের অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ঃ-

মূলতঃ সাহিত্য ও সমাজে নিজের নিষ্পেষিত ও প্রান্তিকায়িত অবস্থান উপলব্ধি করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে প্রত্যাহ্বান জানানোর মধ্যদিয়ে সমাজে নিজের স্বতন্ত্র পরিসর (Space) অর্জনের লক্ষ্যে নারীচেতনাবাদের সৃষ্টি । বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা এ-সংক্রান্ত চিন্তাধারা একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিকরূপ যেমন পেয়েছে, তেমনি চলার পথে অন্যান্য তত্ত্ববীজ বা চিন্তাপ্রস্থান থেকেও প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জন করে নারীচেতনাবাদ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। যেমন মার্ক্সবাদ, মনোবিকলনবাদ, উপনিবেশোওরচেতনা, নিম্নবর্গীয়চেতনা প্রভৃতি তত্ত্বগুলি বর্তমান প্রেক্ষিতে যে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করছে, নারীচেতনাবাদও এই তত্ত্বগুলি থেকে সম্ভাবনাময় পরিসরগুলিকে ব্যবহার করে দিন দিন পুষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে কোন

তত্ত্বকে 'Suspiciously male way of relating to the world' বলে মনে হলেও, নিজেদের পরিসরকে সুনিশ্চিত করতেই 'সম্ভবত male way' তত্ত্বগুলোকেই পুনর্নির্মাণ করে নারীচেতনাবাদ। যেমন নিজের নিষ্পেষণের আর্থ-সামাজিক কারণ ও সাংস্কৃতিক-রাজনীতির স্বরূপ বোঝার জন্য মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির (Marxian economic view) আশ্রয় নিতে হয়েছে নারীচেতনাবাদকে। কিংবা 'নারীচেতনাবাদ যেহেতু মনেকরে পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাসে আধিপত্যমনস্কতা এবং সত্যের একমাত্রিক প্রকাশ ঘটেথাকে চিন্তাজগতে, এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মুক্ত উপসংহারে বিশ্বাসী বিনির্মাণবাদ ও আকরণোত্তরবাদের প্রসার ঘটানোর জন্য জাক দেরিদা এবং রোলাঁ বার্ত-এর সঙ্গে নারীচেতনাবাদ তাই একাত্মতা খুঁজে পায়'। নারীচেতনাবাদের এই সংশ্লেষণী ক্ষমতার জন্যেই বিষয়টি এত ব্যপকতা পেয়েছে বলে নারীচেতনাবাদকে সাম্প্রতিক তত্ত্ববিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

নারীর নিজস্ব পরিসর সন্ধানের দীর্ঘকালীন লড়াইয়ের এই যাত্রাপথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক প্রভৃতি আন্দোলন সৃষ্টি করেছে নারীচেতনাবাদ । বিশেষতঃ বিশ শতকের শেষ পাঁচটি দশকে সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যে আলোড়ন চলেছে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বদলেগেছে প্রতিটি মুহূর্তে - তাতে নারীচেতনাবাদেরও বিভিন্ন রূপ আমরা লক্ষ্য করেছি; নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী চিন্তার প্রকাশও লক্ষ্য করা গেছে । ফলতঃ নারীচেতনাবাদের কোন বিশেষ একটি রূপ আর প্রচলিত নয় আজ, বহুস্বরিকতা তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, আর একারণেই নারীচেতনাবাদ আজ আর এক নয়, অনেক। যেমন শ্বেতাঙ্গ সমাজের নারীচেতনা আর আফ্রিকার নারীচেতনা একদম এক নয়, আবার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিন্নতার জন্যই ভারতবর্ষের নারীচেতনার স্বরূপ কিছুটা আলাদা। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি জাগতে পারে তা হল, এই অনেকরূপ বা অনেকান্তিকতাকে তবুও 'নারীচেতনাবাদ' এর একটি ছাঁচে ফেলা হচ্ছে কেন! এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার

সুযোগ এখানে নেই, তবুও সূত্র হিসেবে এটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্থান-কাল শ্রেণীগত বা আর্থ-সামাজিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র নারী সমাজের লৈঙ্গিক অবস্থানগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা উপলব্ধি এবং প্রতিবেদনকে একসূত্রে গাঁথতে লৈঙ্গিক তত্ত্বের উপযোগীতা অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে টেরি ঈগলটনের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে – "An engagement with theory is unavoidable; there is no nontheoretical space for women to inhabit. However abstract and interactable theory may seem at times, it is an essential aspects of our liberation."[৫০]

নারীচেতনাবাদ মনেকরে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে "কেউ নারী হয়ে জন্মায় না বরং সমাজই তাকে নারী করে তোলে"।[৫১] শিশুকাল থেকেই নারীর জগৎ পিতৃতান্ত্রিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বদ্ধ। সমাজ নারীকে এমন একটি সংস্কার শাসিত বদ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হতে দেয়, যেখানে নারীকে প্রতিপদে এটা মেনেনিতে বাধ্য করা হয় যে, পুরুষ যা করতে পারে, নারীর পক্ষে তা করার অধিকার নেই। শারীরিক ও মানসিক দিকথেকে পুরুষ উন্নত জন্য সে স্বাবলম্বী; অপরদিকে নারী তা নয় বলেই পুরুষের অবলম্বন তার একান্ত আবশ্যক। এই বোধেরই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যকরি এই শাস্ত্রবাক্যটিতে ঃ 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হ্যতি।" নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, নারীর একমাত্র কর্তব্য পুরুষের সেবায় নিজেকে নিবেদন করা এবং সন্তান ধারণের মধ্যদিয়ে পরুষকে নরকের হাত থেকে রক্ষা করা। মনুসংহিতা এবং কোরানের আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায় নারীকে নিছক গর্ভাশয় ভাবার ক্ষেত্রে। মনুসংহিতায় আছে 'নারী হল কর্ষণক্ষেত্র আর পুরুষ বীজতুল্য।' (৯:৩৩) অপরদিকে কোরানে পাচ্ছি 'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শষ্যক্ষেত্র। তাই তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্র যেভাবে খুশি লুঠতে পারো ।'(২:২২৩)[৫২] নারীকে শৃঙ্খলিত করার এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মোটকথা নারীর এরকম একটি আদিকল্প নির্মাণকরে পুরুষতন্ত্র, আর ক্রমশঃ এই সংস্কারগুলোই প্রভাববিস্তার করে

নারীর চেতনাকে এমনভাবে অধিগ্রহণ করে যে এই সংস্কারগুলোকেই নারী স্বাভাবিক বলে মানতে বাধ্য হয়। নারীর ভাষা-শরীর-চেতনা, নারীর জগৎ পুরোপুরি পিতৃতন্ত্রের এই ছায়ায় আচ্ছন্ন বলে নারী তাঁর এই বন্দিত্বকে কখনোই বন্দিত্ব বলে উপলব্ধি করেনি। মনুষ্যত্বের চেয়ে এমন এক কল্পিত নারীত্ব বড় হয়ে উঠেছে সমাজ মানসে, যার আদল পিতৃতন্ত্র তৈরি করেছে নিজের প্রয়োজনে।

পীড়নের এত আয়োজন সত্ত্বেও সমাজ যেহেতু একরৈখিকভাবে চলে না, তাই 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র মতই জেগে ওঠে প্রতিবাদ । মোটামুটি আঠারো শতকে খাঁটি গণতন্ত্রীরা নারী বিষয়ক প্রপঞ্চগুলিকে যুক্তির আলোকে দেখতে শুরু করেন। দিদেরো পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার কথা বলেন। পরে জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম পুরুষ যিনি *The Subjection of Women* (1869) নামে আস্ত একটি বই লিখে ফেলেন নর-নারীর সম অধিকারের সমর্থনে। নারীদের মধ্যে অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে আসেন মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট। তিনি *A vindication of the right of Woman* (1792) গ্রন্থে যুক্তিসহকারে নারীঅধিকারের যাথার্থতা প্রমাণ করেন। পরবর্তীতে মার্গারেট ফুলারের *Woman in the nineteenth century* (1845) প্রকাশ পায়, যেখানে বস্তুগত দৃষ্টিতে নারীর বন্দিত্বের কারণ খোঁজা হয়েছে।[৫৩]

এভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নারীমুক্তি বিষয়ক রচনার যে ধারা তা বিশ শতকে এসে গতি ও বিস্তার লাভ করে একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করে। ভার্জিনিয়া উলফ্ *A Room of one's own* (1929) গ্রন্থটিতে পুরুষের তুলনায় নারীর বাস্তব পরিস্থিতির ভিন্নতা উল্লেখ করে নারীর সাহিত্যকর্মের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বই *Three Guineas* (1938) এ

বিভিন্ন জীবিকা কিভাবে পুরুষতন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেদিকে আলোকপাত করেছেন। 'নারীচেতনাবাদের বিকাশে উল্‌ফের মুখ্য অবদান হল এই সচেতনতা যে, লিঙ্গগত অভিজ্ঞান আসলে সামাজিক নির্মিতি। সমাজ যখন অচলায়তনে পরিণত হয় তখন লৈঙ্গিক পরিচয়ও স্থবিরতার আকর হয়ে ওঠে। তাই সমাজ বিকাশের ঐকান্তিক প্রয়োজনে ঐ নির্মিতিকে প্রত্যাহ্বান জানাতে হয়, রূপান্তরিত করে নিতে হয়। উলফ্ নারীর যে আদিকল্পকে 'The Angel in the Home' বলে প্রতীচ্যের পুরুষতন্ত্রের নারীপ্রতিমা নির্মিতির দিকটি তুলে ধরেছেন, তার সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় যৌথ নিশ্চেতনায় আজও অত্যন্ত প্রবল ভাবে স্থিত গৃহলক্ষী হয়ে ওঠার সাধনায় নারীত্বের চরম সিদ্ধি এই ধারণার'। এরই পাশাপাশি এই পরিস্থিতিতে কোন নারী লেখিকা হতে চাইলে তাকেও যে আসলে স্বতন্ত্র সময় ও পরিসর তৈরি করে নিতে হবে, যার দ্বারা সৃষ্টি হবে তার নিজস্ব লিখন বিশ্ব, সে বিষয়েও উল্‌ফ আলোচনা করেছেন। সিমোন দ্য বোভোয়ার *The Second Sex* (1949) আজও নারীচেতনাবাদীর আবশ্যপাঠ্য। একদিকে বোভোয়া নারীসত্তার বস্তুগত ভিত্তি সন্ধান করেছেন, অন্যদিকে নারী ও পুরুষের লৈঙ্গিক ভিন্নতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ওপরও আলোকপাত করেছেন। জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরুষশক্তি কীভাবে নারীকে প্রান্তিকায়িক করে রাখে, বোভোয়া তা বিশ্লেষণ করেছেন। উল্‌ফের মতো বোভোয়াও নারীত্বকে সামাজিক নির্মিতি হিসাবে দেখলেও আরও একটু প্রসারিত হয়ে বোভোয়া যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এরই পাশাপাশি পুরুষতন্ত্র দ্বারা উপনিবেশিকৃত নারীমন কিভাবে ইতিহাসের নতুন পাঠ তৈরি করতে পারে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে নারীর অবস্থান বোঝার জন্য আমরা বোভোয়ার মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি "One is not born, but rather becomes a woman, ... it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunuch,which is described as feminine. On the intervention of someone else, can establish and individual as an

other."[৫৪]

মোটকথা নারীচেতনাবাদ যেহেতু মনেকরে "Texts have no fixed meaning: interpretation depend on the situation and ideology at the reader."[৫৫] তাই সাহিত্যিক প্রতিবেদনের পুনঃপাঠের মধ্যদিয়ে নারীপরিসর সন্ধান এবং ইতিহাস যেহেতু পুরুষতন্ত্রের নির্মাণ তাই পুনঃপাঠের মধ্যদিয়ে ইতিহাসের নির্মাণ নারীচেতনাবাদের অন্যতম কৃত্য ।

২.৩.২ - বাংলায় নারীবিষয়ক চিন্তাধারা ঃ-

অধ্যায়ের এই অংশটিতে আমরা লক্ষ্য করব উনিশ শতকে নারীদের পক্ষে কি কি সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং সাহিত্যে কিভাবে নারীর উপস্থাপন ঘটেছে। এই দুটি দিক পাশাপাশি অনুধাবন করলে উনিশ শতকে নারীবিষয়ক চিন্তাধারার মধ্যে কতখানি স্ববিরোধ ছিল তা বোঝা যায়।

উনিশ শতকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জীবনভাবনার সংঘর্ষের ফলে সমাজে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব নারী-বিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পড়েছিল। প্রাচ্য-প্রচীত্যের ভাবধারার টানা-পোড়েন নারীকেন্দ্রিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও গতি ও পশ্চাৎপরতার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। একদিকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ন্যায় আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরা যেমন ছিলেন, তেমনি অপরদিকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রক্ষণশীলরাও ছিলেন। তবুও শত বাধা-বিপত্তি সত্বেও এই সময় নারীদের পক্ষে বেশ কিছু সংস্কার সাধিত হয়। এরই সাথে সাথে নারীবিষয়ে জনসাধারণের এতদিনকার মনোভাবের কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়। এরই ফলস্বরূপ সতীদাহের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে আন্দোলন ক্রমশঃ জোড়ালো হয়ে ওঠে। তবু এতকিছু সত্বেও সমাজ-মানসিকতা নারীকে

পুরুষের সমমর্যাদায় ভাবতে পারেনি, হয়তো এতদিনের পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাসের জাড্যের ফলেই। সে সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীদের লেখা প্রকাশিত হতে থাকলে জনমানসে এর প্রতিক্রিয়ার দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় আলোকপ্রাপ্তবর্গ নারীমুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও পিতৃতন্ত্রের প্রভাবথেকে তারা একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি । ছাপার দুনিয়ায় মেয়েদের কবিতা প্রকাশিত হলে সে সব কবিতা মেয়েদেরই লেখা কি না সে ব্যাপারে কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি । কিন্তু কোনো মেয়ে যুক্তিমূলক গদ্য লিখলে, লেখাটি কোনো মেয়েরই কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হত, সম্ভবত এই মানসিকতা থেকে যে, মেয়েদের যুক্তিপূর্ণ ভাবনার অধিকার নেই । ১৮৬০ সালে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় বামাসুন্দরীর গদ্যরচনা প্রকাশিত হলে লেখা শুরু হবার আগে ছিল *সোমপ্রকাশ* সম্পাদকের প্রমাণপত্র - তিনি লিখেছিলেন, তিনি বিশেষভাবে জানেন লেখাটি মহিলা নিজেই লিখেছেন। পাঠককুল সন্দেহ করতে পারে - এমন আশঙ্কা যে করেছিলেন সম্পাদক, তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, লেখাটি আদৌ ভাবাবেগপূর্ণ লেখা নয়, ভাবনামূলক লেখা। *কি কি কু-সংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে* এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে সেই লেখায়। এই লেখিকারই আরও একটি লেখা ১৮৬২ তে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হলে সেক্ষেত্রেও সম্পাদককে বলেদিতে হয়েছিল যে, 'লেখাটি সত্যই কোমল কর হইতে বিনির্গত।' এই লেখার সবটাই ছিল নারীর পরাধীন অবস্থার জন্য বিলাপ। এমন কথাও সেখানে আছে যে নারীর বেদনাতে পুরুষের বেদনা পাবার কথা নয়, কেননা 'তাঁদের চাকরাণীর কাজ, রসুয়ের কাজ আনায়াসে চলিয়া যাইতেছে'। ১৮৬৩ তে কৈলাসবাসিনীর প্রবন্ধপুস্তক *হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা* প্রকাশিত হলে সেখানেও ছিল আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের প্রমাণপত্র। আবার *বঙ্গমহিলা* কিংবা *বামাবোধিনী*র মত নারীকেন্দ্রিক পত্রিকা প্রকাশিত হলে সেখানেও দেখা যায় পুরুষতন্ত্রের উপদেশ বা Guide line, এই ছিল নারীর প্রতি শিক্ষিতবর্গের মানসিকতা।[৫৬]

রঙ্গলালের কাব্যে এবং বিশেষভাবে মধুসূদনের সাহিত্যিক কর্মে পুরাণের নারীদের বিনির্মাণ ঘটলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে নারীর প্রতিমায়িত উপস্থিতি প্রকট

হয়ে উঠেছে আবার। প্রসঙ্গত আমরা সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি।

> "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসিক প্রতিবেদনে বাস্তবের প্রকৃত পরিসর ঝাপসা হয়ে গেছে রূপকের অবিরল উপস্থিতিতে ... সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল বঙ্কিমের প্রধান নারীরা প্রায় সবাই পথে বেরোয়; অবরোধের জাল কেটে বেরিয়ে নিজের জন্য পরিসর সন্ধান করে যেন। অবশ্য পথ আবার তাদের ফিরিয়ে দেয় ঘরে, দাঁড়ের পাখি আকাশ পরিক্রমায় যেতে পারে না বলে ফের দাঁড়ে এসে বসে। আমাদের মনে পড়ে বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লেখিকা রাসসুন্দরীর কথা। প্রায় অশিক্ষিতা এই গ্রামীন মহিলা নারীর প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে চাঁছাছোলা ভাষায় জানিয়েছেন, 'লোকে আমোদ করিয়া পাখি পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া থাকে, আমার সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিজ্জরে জন্মের মত বন্দী হইলাম। আমার জীবস্কশাতে আর মুক্তি নাই।' এই মন্তব্যের পৃষ্ঠভূমিতে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমায়িত নারীদের কথা বিবেচনা করি, বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর প্রতিবেদনে আসলে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত সত্যভ্রম প্রকটভাবে উপস্থিত।"[৫৭]

মোটকথা সাহিত্যে মূলস্রোত বলে যে পুরুষস্রোত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে নারীব্যক্তিত্ব নয়, প্রসাধিত নারী প্রতিমার চর্চা চলছিল, এলেন শোয়ালটেরের নিরিখ অনুযায়ী সাধারণভাবে এরা হল 'stereotypes of women' এবং মূল কথা হল 'We are not learning what women have felt and experienced, but only what men have thought women should be.'[৫৮]

২.৩.২.১. রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারী পরিসর -

এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষকরে উপন্যাসে প্রতিফলিত নারী চরিত্রের দিকে ফিরে তাকাতে পারি এবং আবিষ্কার করতে পারি রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী পরিসর।

নারীবিষয়ক পুরুষতন্ত্রের উৎপাদিত প্রপঞ্চগুলোকে যুক্তির আলোকে দেখেছিলেন বলে লোকহিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছেন - "স্ত্রীলোককে সাধ্‌ধীরাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে - তাই স্ত্রী লোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই - ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৫৯] রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর একটি বিশিষ্ট স্বাধীন সত্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নায়িকারা সকলেই কমবেশি প্রতিবাদী, এরা কেউ সেই অর্থে বিদ্রোহী হয়ে উঠেনি, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রকৃত সময় ও আপাত সময়ের বাস্তবতার ওপর দায়িত্বশীল ছিলেন বলেই। নারীচেতনাবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্র উপন্যাস পাঠে তাই এমনকিছু ইঙ্গিত আমরা পাই যা সমসাময়িক কালের কথা বলেও ভবিষ্যতের নারীচেতনাবাদীর ভাবনার আকর হয়ে উঠতে পারে। এ-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা উপন্যাসগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে করা হবে। এখানে শুধু সূত্র হিসেবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। উনিশ শতকে আলোকপ্রাপ্তবর্গও যে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিল সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। নতুন যুগে পুরুষের জীবনে যত পরিবর্তনই আসুক না কেন, মেয়েদের জীবন যাতে অপরিবর্তিতই থাকে, পুরুষের জীবনে প্রতীচ্যের ভাবধারার সংঘাতে যত চাঞ্চল্যই আসুক মেয়েদের মধ্যে যেন থাকে স্থায়িত্ব এই নিয়ে পুরুষের ভাবনা এবং লেখালেখির অন্ত ছিলনা সেদিন। হিন্দুত্ববাদের সাথে পদে পদে আপোষ করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের উত্থানে জাতীয়তা রক্ষার দায়টাও সেই সঙ্গে মেয়েদের উপরেই বর্তেছিল। রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন - – "পরিবর্তন অর্থেই উন্নতি নহে - কেশ বিন্যাস বাহ্য চাকচিক্যমাত্র প্রাচীনকালের দোষ-গুণ লইয়া হিন্দু রমনীগণ যে মূর্তিতে গৃহখানিকে স্নেহ ও ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ করিয়া রাখিতেন - সেই পবিত্র প্রভা তিরহিত হইলে হিন্দুর গৃহস্থালীর প্রকৃত শোভা চলিয়া যাইবে। বাহিরে আমরা অপমানিত, হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত উপর মুখাপেক্ষী - গৃহভিন্ন আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়।" ঘর ও বাহিরের এই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে আমরা রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের নিবিড় পাঠ করতে পারি এবং বুঝতে পারি বিমলার মধ্যদিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বাইরে বেরোনোর কোন বার্তা

আমাদের দিয়েছেন। কিংবা সাম্প্রতিক নারীচেতনাবাদ বিবাহের মত বন্ধনকেও যখন প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছে তখন ১৯২৯ এ লেখা *যোগাযোগ* উপন্যাসের প্রসঙ্গ আনতে পারি। যেখানে রবীন্দ্রনাথ কুমুদিনীর মাধ্যমে যে নীরব প্রতিবাদ দেখিয়েছেন, সেখানে বিবাহ এবং দাম্পত্য সম্পর্কের মূল ভিত্তিকেই যেন রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছেন 'একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।'

নারীর মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন – ''আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করছে। ... সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য'', রবীন্দ্র উপন্যাসে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর 'মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি'র বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়। *বিনোদিনী, দামিনী* এরা বিধবা হয়েও তাই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধজনিত বৈধব্যের প্রশ্নহীন সংস্কারে বন্দি থেকে আপন ভবিতব্যকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সবকিছু বিনা বিচারে মেনে না নিয়ে প্রবল ব্যক্তিত্বে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চেয়েছে। *কুমুদিনী* অপরদিকে স্বামী নামক আইডিয়াকেই প্রশ্ন করেছে। সংসারের বিরাট কর্মপ্রবাহে পুরুষের সহযোদ্ধা রূপে *সুচরিতা* ও *ললিতা* বিশেষ অর্থেই আধুনিক। আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণী রবীন্দ্র উপন্যাসের বিষয় হওয়ায় এবং সময়টা যেহেতু সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণকাল, এর অভিঘাত নারীর মধ্যেও অনিবার্যভাবেই পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অচল অটল সংস্কার নিয়ে নারী একান্তই পুরুষের আশ্রিত, পুরুষের ভোগ্য, বিনাপ্রশ্নে পুরুষতন্ত্রের আজ্ঞাবহনকারী দাসী হলেও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনেকটাই সচেষ্ট হয়ে ওঠে, শিক্ষা তার মধ্যে জন্ম দেয় প্রতিপ্রশ্নের। রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়িকারা এই বিশেষত্বে বিশেষিত। খণ্ডিত আধুনিকতায় নারীবিষয়ক চিন্তাধারা যখন গতি ও পশ্চাৎপরতার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল, সে সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উস্কীপ্ত রবীন্দ্র নায়িকাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাই আজকের নারীচেতনাবাদীর কাছে প্রেরণার আদি উৎস রূপে গৃহীত হতে পারে।

২.৪.১ - বৃত্তে সমন্বয় ঃ ঔপনিবেশিক বাংলার বিশেষ পরিবেশে উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ এবং নারীচেতনাবাদের ঐক্যসূত্র সন্ধান ঃ-

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা ও স্ববিরোধ ছিল তা কিভাবে নারীবিষয়ক চিন্তাধারার মধ্যেও প্রভাব ফেলেছিল তা অধ্যায়ের এই অংশটিতে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে যে আধুনিকতার সূত্রপাত বাংলায় হয়েছিল অসংখ্য সীমাবদ্ধতা থাকলেও তার ইতিবাচক দিকটিকেও অস্বীকার করা যায় না, বাংলার রেনেসাঁর একটি নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য আছেই। মধ্যযুগের থেকে আধুনিকযুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ রেনেসাঁর মধ্যদিয়ে ঘটলেও যুগ থেকে যুগান্তরের যাত্রাপথে অতীত যুগের সাথে কখনই সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটে না, 'নতুন যুক্তিবোধের সঞ্চারের ফলে বিচ্ছেদের শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে'।[৬০] বাংলার রেনেসাঁর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে সংঘটিত হওয়ার ফলে এবং কোনো বাস্তব পশ্চাদভূমি না থাকার ফলে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার সঙ্গে পদে পদে আপোষ করে গড়ে ওঠা আমাদের রেনেসাঁ শুধুমাত্র যে অসম্পূর্ণ খণ্ডিতই হয়েছে তা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে এর সামাজিক ফলাফল বিষময় হয়েছে। আর এই খণ্ডিত আধুনিকতা যেহেতু উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ শতক পেড়িয়ে একুশ শতকেও গড়িয়ে এসেছে তাই আজও আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুক্তিবোধ এবং কুসংস্কারের এক অদ্ভুত সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ফলতঃ বড়দিনের কেক ও পৌষ পার্বনের পিঠেপুলি, ২ জি. র দামে ৩ জি. পরিষেবা উপভোগ এবং অপদৃষ্টি কাটানোর জন্য শনিপূজা, ভবসংসার পেরোবার জন্য মাসে অন্তত একবার হরির লুঠের আসর; রামজন্মভূমি, সেতুসমুদ্রম, অষ্টপ্রহর কীর্তণ থেকে শুরু করে ইনস্যাট টু, মঙ্গল গ্রহের দোষ কাটানোর জন্য তাবিজ কবজ এবং মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধানরত পাথ-ফাইণ্ডার চর্চা সবই চলছে জোড়কদমে। এ এক বিচিত্র সহাবস্থান।

বৃটিশ শাসকরা আমাদের দেশের পুরাতন সমাজব্যবস্থার অনেক কিছু ওলট পালট করলেও এদেশের Surrounding Economy সামন্ততান্ত্রিক রূপের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। বরং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যদিয়ে একটা বিরাট সংখ্যক ভূমধ্যশ্রেণী তৈরি হওয়ায় এবং এদেশীয়দের মূলধন আধুনিক শিল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে স্থিতাবস্থার সমর্থকসূচক সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার উপস্থিতি পূর্ণমাত্রায় থেকেছে। ফলতঃ এই নবজাগরণ সমাজের 'Institutional power-structures' যেমন জাতি-বর্ণ ভেদ, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রভৃতির কোনো উন্নতিশীল পরিবর্তন করতে পারে নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে যারা অর্থশালী তারা জমিদারি কিনেছে, ফলত বাণিজ্য থেকে পুঁজি সরে এসেছে। এক্ষেত্রে একটা মত প্রচলিত, বাংলার দায়ভাগ আইন এমন যে কর্তার কর্তৃত্ব ও সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রশ্নাতীত; ভারতে অন্যত্র, যেখানে মিতাক্ষরা আইন চালু, জন্ম মাত্রেই পুরুষ-সন্তান পারিবারিক সম্পত্তির আংশিক অধিকারী। এর ফলে নাকি দায়ভাগের আওতায় থাকা প্রজন্মের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নতুন কিছু করার, পুঁজির বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয় না, কর্তার ছায়ায় গতানুগতিকতার ধারায় তারা উদ্যম হারিয়ে ফেলে।[৬১] বাংলায় এদেশীয়দের যথেষ্ট মূলধন থাকা সত্ত্বেও তাদের স্বাধীন শিল্পের প্রতি আকর্ষিত না হওয়ার একটা কারণ অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূলতা, তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়, এর পেছনে বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব সমাজনীতির দায়িত্বও কম ছিল না।

সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সেই সমস্ত সমাজে শিল্পোদ্যোগী মানুষের সংখ্যাধিক্যহেতু দ্রুত অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে, যে সমাজ যত বেশি ব্যক্তিমুখী; যে সমাজের নেপথ্যচালক ধর্ম যত বেশি ইহজাগতিকমুখী; পুরাতন সামাজিক প্রথা ঐতিহ্যমুখী নয়। এই সমাজই ব্যক্তিমানুষের (Individual) মধ্যে কৃতিত্ব প্রবণতা (সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় যাকে 'n Achievement' বলা হয়) জাগানোর সম্ভাবনা বেশি রাখে। ম্যাকক্লেল্যাণ্ডের

মতানুযায়ী - "The major proporition supported by these findings is that is societies which subsequently develop rapidly economically, the force which holds society together has shifted from tradition, particularly impersonal institutional tradition, to public opinion which helps define changing and functionally specific interpersonal relationship. ... an other - directed society should be one in which ego is not motivated to interact by traditional institutional pressures but by pressures from others, particularly peers... "[৬২] এই মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, ব্রাহ্মণ্যবাদী সনাতন হিন্দুধর্ম যার মূল অভিমুখ অপার্থিবতা, যা পার্থিব বা ইহজাগতিক বৈষয়িকতার থেকে ঢের বেশি গুরুত্ব দেয় অপার্থিব বা আধিজাগতিকতার ওপর, সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম শত আচার বিচারে বদ্ধ বাংলাদেশের সমাজের নেপথ্য চালিকা শক্তি হওয়াটাও কিছুটা হলেও বাংলায় ব্যক্তিগত কৃতিত্বকামী (n Achievement) উদ্যোগী পুরুষের স্বল্পতার জন্য দায়ী। তাই দেখাযায় বাংলায় এদেশীয়দের যথেষ্ট মূলধন থাকা সত্বেও এরা স্বাধীন শিল্পের প্রতি আকর্ষিত হয় নি। না হওয়ার একটা কারণ অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূলতা, তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়, এর পেছনে বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব সমাজনীতির দায়িত্বও কম ছিল না।অথচ শিল্পায়নের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের পিছনে শিল্পায়নের কোনো নিগূঢ় কার্য-কারণ যোগ না থাকার ফলে আমাদের আধুনিকতা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুটোই জন্মসূত্রে পঙ্গু হয়ে গড়ে উঠেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর renaissance ও reformation এর ক্ষেত্রেও তাই অজস্র পিছুটান লক্ষ্য করা গেছে। উপরন্তু দেশের একটা বড় অংশ অজ্ঞানতা অশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে থাকায় আমাদের দেশের মতো ঐতিহ্যানুযায়ী সমাজে (Tradition bound Society) সামাজিক Institutional Power Structure দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করেছে। লক্ষণীয় উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে রামমোহনের সতীদাহ রদ আন্দোলন এবং ব্রাহ্মসভার বিরুদ্ধে ধর্মসভার গঠন

(১৭ ই জানুয়ারী, ১৮৩০) এবং শতকের শেষ পর্বে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের দানা বেঁধে ওঠা সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যেন নব্য হিন্দুত্বের (Neo-Hinduism) বেশে পুরাতন হিন্দুভাবের পুনরুজ্জীবন, যার সর্বগ্রাসী প্রভাব আরও প্রবল। নইলে ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্ম, তত্ত্ববোধিনী সভা, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বিচিত্র প্রবণতা সমাজদেহে বহু আলোড়ন তুললেও পরিণামে হিন্দুত্বের কৃষ্ণগহ্বরে লীন হতে পারত না। এর থেকে আমাদের যৌথ নিশ্চেতনায় ধর্মভাব কতটা প্রবল এবং আধুনিকতার যুক্তিবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা যে সেই ধর্মভাবকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি, তার প্রমাণ মেলে।

রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র এই দুজন কেশবগোষ্ঠী বিরোধী আদি ব্রাহ্ম যে হিন্দু মেলার প্রবর্তন করেন, (প্রথম অধিবেশন - ১৮৬৭) সেখানে শুধু হিন্দুত্বের নয়, স্বাদেশিকতার প্রেরণাও ছিল। হিন্দুত্ববাদের সাথে স্বাদেশিকতার এই বিপজ্জনক মিশ্রণ কালক্রমে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। শিক্ষিত শ্রেণীর সকলেই জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়ায় তাঁদের চেতনায় ভারত ঐতিহ্য ও হিন্দুঐতিহ্য সমার্থক হয়ে উঠেছিল। সুশোভন সরকারের ভাষায় –

> "ঐতিহ্যপন্থী প্রাচ্যবাদের মধ্যে তাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল একটি দ্বিতীয় উপাদান ঃ হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছিল এ রকম - ভারতবর্ষের সভ্যতা মানেই হিন্দু সংস্কৃতির ইতিহাস আর খোদ ভারত দেশটাই হচ্ছে হিন্দু চরিত্রবিশিষ্ট। নবজাগ্রত শিক্ষিত সমাজের প্রায় সবাই জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়ার দরুন এই ধরনের চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হয়ে উঠতে পেরেছিল।"[৬৩]

জন্মসূত্রে হিন্দু এই শিক্ষিত শ্রেণীর প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রবীণ ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু *বৃদ্ধ হিন্দুর আশা* (১৮৮৭) রচনায় 'মহা হিন্দু সমিতি' স্থাপনের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা পঠিত হয় কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে। সেখানে লেখা হয় –

> "মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Urasian and Anglo Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দুদিগের আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে। ... হিন্দু জাতির উন্নতিসাধনার্থ কোন সভা যদি ধর্মমূলক না করিয়া সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে বুনিয়াদশূন্য, ও গাঁথুনিশূন্য আল্‌গা ইষ্টকের বাড়ী যেমন প্রবল বায়ুর প্রথম ঝটিকাতে পড়িয়া যায়, তেমনি সভা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য মহা হিন্দু সমিতিকে ধর্মমূলক করা হইয়াছে।"[৬৪]

অনেক উদাহরণের মধ্যথেকে এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তথেকে বোঝা যায় হিন্দুত্ববোধ এবং জাতীয়তাবোধ কিভাবে একে অপরের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বেড়ে উঠছিল। এর লৌহপ্রাচীরে নবজাগরণের আদর্শ ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে, আজও হয়ে চলেছে। আর ঠিক এ-কারণেই বাল্যবিবাহ আজও হয়ে চলেছে, বিধবা বিবাহ আজও নিন্দনীয়, বর্ণবৈষম্য আজও বিদ্যমান এবং আজকের উচ্চডিগ্রীধারী সুউপার্জিকা নারীর মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়, এ যেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হ্যতি'র প্রলম্বিত ছায়া।

এরকম একটি খণ্ডিত আধুনিকতায় নারী-সংক্রান্ত চিন্তাধারার উন্মেষ ও বিকাশ হওয়ায় নারী বিষয়ক চিন্তাধারাও হয়েছে খণ্ডিত। উনিশ শতকে নারীর বিদ্যাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ভাবেই শিক্ষার সঙ্গে স্বয়ংস্করতার প্রশ্নটি যুক্ত করা হয়নি। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভাল মা, আদর্শ স্ত্রী হওয়া। এ যেন নারী-সংক্রান্ত সনাতন আদর্শের সফিস্টিকেটেড

রূপ। একারণেই "বালকদের বিদ্যালয়ে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়ানো হচ্ছে। বালিকারা সূচিশিল্প ও গার্হস্থ্য বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেই তৃপ্ত। সুতরাং উনিশ শতকে মোটামুটিভাবে সাধারণ জ্ঞানার্জনের মাত্রার বাইরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মতো মুক্ত বিদ্যার বিষয়ে জ্ঞানার্জন নারীদের জন্যে প্রয়োজনীয় মনে করা হত না।"[৬৫] অর্থাৎ এমন শিক্ষা নারীকে দেওয়া হত যাতে পুরুষের কর্তৃত্বকে নারী প্রশ্ন করতে না পারে। নারীর শিক্ষা নির্ভরশীল ছিল পুরুষের চাহিদার উপর। পুরুষ যেভাবে নারীকে দেখতে চাইত এবং তার জন্য যতখানি শিক্ষা বা স্বাধীনতা প্রয়োজন, ততখানি শিক্ষা বা স্বাধীনতাই স্ত্রীর জন্য বরাস্ক ছিল। এ যেন 'We are not learning what women have felt and experienced, but only what men have thought women should be.'[৬৬] এরই প্রায়োগিক রূপ। "স্ত্রীরা ইংরেজী শিখলে ভাল হয় সত্যি, কিন্তু তারা বিবি হবেন না, হবেন না ব্যতিক্রমী চরিত্র। পা বাড়াবেন না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর বাইরে। সেজন্যই তো জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পারিবারিক রীতি লঙ্ঘন করে স্বামী ব্যতিরেকে একলা গভর্নমেন্ট হাউসের ভোজসভায় গিয়েছিলেন বলে প্রসন্ন ঠাকুর ক্ষোভে লজ্জায় সেখান থেকে পালিয়েছিলেন। মোট চাহিদাটা এই যে, মেয়েরা একদিক দিয়ে পাশ্চাত্যের মেয়েদের মতো শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবেন, সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুপালন করবেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে স্বামী সহায়তা করবেন, অন্যদিকে প্রাচীন আর্যনারীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিসেবা করবেন, শিশুমানস গঠন করবেন এবং আপন চরিত্র মহিমায় সমগ্র পরিবার ধর্ম আলোকিত করবেন।"[৬৭]

নারীকে পুরুষ এই চোখেই সেদিন দেখতে চেয়েছিল। মনে পড়ে *ঘরে-বাইরের* নিখিলেশের কথা এবং অনুভব করি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা কতটা প্রাগ্রসর ছিল। দেশে সর্বজনীন অবশ্য শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন শিক্ষাই পারে সমাজের অবহেলিত শ্রেণীকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে। *শিক্ষার বাহন* প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন – "প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে

কথা বলা বাহুল্য। অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড়ো সহায়, - এ কথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি ঠেলাটা সবচেয়ে বড়ো কাজ সে দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন। ... কিন্তু, দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।"[৬৮] শিক্ষার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা এখান থেকে সহজেই বোঝা যায়।

এরপর নিরালম্ব আধুনিকতার মধ্যে গোপনে লালিত হতে থাকা হিন্দুত্ববোধ যখন হিন্দুপুনরুত্থানবাদের জন্ম দিল তখন এর চোরাবালিতে নবজাগরণ নিজেই তলিয়ে গেল। যুক্তিবাদ ভক্তিবাদে নিমজ্জিত হল। এই পর্যায়ে নারীকে আবার প্রাচীন আর্য নারীর আদর্শে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারের ধারা, নব্য হিন্দুধর্মের এই আন্দোলনের ফলে স্বভাবতই ব্যহত হয়। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা এ-সময় বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রী শিক্ষার কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একুশ বছর পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও সমাজ তা ভালো চোখে দেখে নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেছে –

"গত তিন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুইজন এল.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে

অনেকে বি.এ, এম.এ পরীক্ষা দানে কৃতকার্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন ... কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার কি শুভকর ফল তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি। ... আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাহারা ধর্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতিবিচ্যুত হইবেন।"[৬৯]

এমনকি যে 'সোমপ্রকাশ' হরিসভা গুরুবাদ প্রভৃতি প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা করেনি, তারাও 'হিন্দু রমণীর সতীত্বের আদর্শ' রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী হয়ে উঠেছিল –

"হিন্দুর সমাজবন্ধনী যেমন দৃঢ়, লোকের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার পক্ষে যেমন অনুকূল, তেমন আর পৃথিবীর কোন জাতিরই নহে। ... হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপকেরা দেখিলেন স্ত্রীলোকের চরিত্র নির্মল রাখিতে গেলে তাহাদের কমনীয়কান্তি, সুন্দর বদনচন্দ্রিমা লোকলোচনের অন্তর্হিত করিয়া রাখা চাই; তাই সভ্য নীতিসঙ্গত অবরোধপ্রথা হিন্দুসমাজের ভিতর প্রবর্তিত করিলেন। এই অবরোধপ্রথার ফলে হিন্দুরমণীরা জগতের সম্মুখে সতীত্বের আদর্শস্বরূপে পরিচিতা হইয়াছেন।"[৭০]

তাই একদিকে যখন রাসসুন্দরী দেবী দাম্পত্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছেন –

"লোকে আমোদ করিয়া পাখি পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম। আমার জীবনদশাতে আর মুক্তি নাই।"[৭১]

অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের *প্রফুল্ল* দাম্পত্যের জয়ধ্বজা উচ্চে তুলে ধরছেন। দেবী চৌধুরাণীকে ক্ষমতার শীর্ষে তুলেও বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়ে আনলেন গৃহকর্ম সম্পাদনায়, এমনকি সতীনের

সঙ্গে একত্রবাসও *প্রফুল্লকে* করতে হল –

> "এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও - আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন'।"[৭২]

স্ত্রীশিক্ষায় অমত না থাকলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২) তে লিখলেন –

> "আর্য্যপ্রণালীতে ধর্মভাবের আধিক্য, ইউরোপের প্রণালীতে ভোগসুখের আধিক্য। আর্য্যপ্রণালীতে স্ত্রী দেবী, ইউরোপের প্রণালীতে স্ত্রী সখী এবং সহচরী। ... ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া সাহেব হইয়াছেন, মেয়েরা ইংরাজী না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল। ... গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটি হইয়া যায়, যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদ্রকায়, স্বল্পবল, রুগ্নদেহ হইয়া জন্মে, সর্বদাই পীড়িত হয়, স্বল্পায়ু হইয়া থাকে, অথবা অকালেই চলিয়া যায়।"[৭৩]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এই আক্ষেপ থেকে নারীর কোন ভূমিকা সে সময় কাঙ্খিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এই মানসিকতা আজও বিদ্যমান।

তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ তো বটেই এমনকি *বামাবোধিনী* (১৮৬৩) *ভারতী* (১৮৮৪), *অন্তঃপুর* (১৮৯৮), *ভারত মহিলা* (১৯০৫), প্রভৃতি নারী-উস্কিষ্ট পত্রিকাগুলিতেও আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জননী, আদর্শ গৃহিণী সংক্রান্ত প্রাচীন ধ্যানধারণা সম্বলিত উপদেশ বর্ষিত হয়েছে।[৭৪] ভারতে তথা সমগ্র এশিয়ায় প্রথম নারী-উস্কিষ্ট পত্রিকা তার উস্কেশ্য সম্পর্কে লিখেছে –

> "বঙ্গরমণীগণকে সর্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা বামাবোধিনীর উস্কেশ্য, এইজন্য সর্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ... জ্ঞানপ্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উস্কেশ্য হইলেও এই জ্ঞান যাহাতে ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারীজীবনের যথার্থ শোভা সম্পাদন ও কল্যাণবিধান করে, বামাবোধিনীর ইহা

প্রাণগত ইচ্ছা, এইজন্যই পাঠক পাঠিকার মনে ধর্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রথম হইতেই প্রয়াস পাইয়াছেন।"[৭৫]

'ধর্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের' এই উদ্দেশ্য যে প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রাচীন হিন্দু আদর্শে সীতা সাবিত্রী বেহুলার আর্কিটাইপ তা সহজেই অনুমেয়। একারণেই আর্য্যনারীর 'প্রকৃত গুণাবলী'র পুনর্জাগরণকল্পে *বামাবোধিনী*র পৃষ্ঠায় লেখা হয় –

"স্ত্রীরা উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সময়, স্বামীকে আচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে; অধ্যয়ন ও ধর্মোপদেশের সময়, ছাত্রগণের ন্যায় নম্র ও বিনীত হইয়া নীতিগর্ভ উপদেশ সকল সাদরে গ্রহণ করিবে; গৃহকার্য্যানুষ্ঠানের সময়, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করিবে; বিপদুদ্ধারের সময় উপকৃত ব্যক্তির ন্যায় কৃতজ্ঞ হইবে। এই সংসারের মধ্যে স্বামীরাই স্ত্রীগণের একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীরা সর্বদা স্বামীদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করিতে যত্নশীলা হইবে।"[৭৬]

কিংবা "স্ত্রীলোকদিগের পরম পবিত্র পতিব্রতা ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ... প্রশংসনীয় বিষয় আর কিছুই নাই।" (ভাদ্র, ১২৭৬)। কিংবা "সতী স্ত্রী পতিকে নিত্যভজনা করিবেন।... যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে হরিভাবদ্বারা ভজন করেন, তিনি পরলোকগামিনী হইয়া হরিরূপ পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বসুখ সম্ভোগ করেন।" (বৈশাখ, ১৩১১)[৭৭] পরবর্তী কালে স্বদেশী আমলে জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্ববাদ একসূত্রে গ্রথিত হওয়ায় নারীর মাতৃমূর্তি আরও একবার প্রকট হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ দেখাযাচ্ছে বাংলায় নারীচেতনাবাদ এবং উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ গোপন সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্কে সম্পর্কিত। একে অপরের যেন পরিপূরক। উপন্যাসের মধ্যে এই দিকটি কিভাবে বিধৃত হয়ে আছে তা রবীন্দ্র উপন্যাসের সচেতন পাঠে লক্ষ্য করা যায়।

নির্দেশিকা ঃ-

১. Abrams, M.H. : *A Glossary of Literary Terms*, Seventh Edition, Harcourt College Publishers, Singapore : 2001, p. 256

২. Abrams, M.H. : *Ibid,* p. 257

৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর ঃ ২০০২, পৃঃ ৮৩

৪. Abrams, M.H. : *Ibid,* p. 257

৫. Barry, Peter : *Begining theory*, T.R. Publication, Chennai : 1999, p. 191

৬. Abrams, M.H. : *Ibid,* p. 236

৭. Boehmer, Elleke : "Postcolonialism." *Literary Theory and Criticism*, ed. Patricia wough, Oxford : 2007, p. 341)

৮. Abrams, M.H. : *Ibid,* p. 236

৯. Said, Edward, W : *Orientalism*, Penguin : 1995, Pp. 2-3

১০. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, পৃঃ ১২৬

১১. Fanon, Frantz : *The wretched of the Earth*, Penguin : 1980, Pp. 229 - 31

১২. Spivak, Gayatri Chakravorty : *In Other worlds: Essays in Cultural Politics*, Routledge, 1987, p. 239

১৩. Barry, Peter : *Ibid,* p. 192

১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীরঃ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, পৃঃ ১৩১

১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ঃ ২০০৪, পৃঃ ১২৫

১৬. Pollard, A.F. : Factors in Modern History, London, 1932, Pp. 43-44 (বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৭, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৮)

১৭. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, আনন্দ, কলকাতা ঃ ১৪১৪, পৃঃ ১২১

১৮. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা ঃ ১৩৯১, পৃঃ ১৪৩-৪৪

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ, কলকাতা ঃ ২০০০, পৃঃ ১১২

২০. Kidron, Michael : Foreign Investment in India, London, 1965, P. 14 (বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০১)

২১. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, পৃঃ ১২১

২২. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার নবজাগৃতি*, পৃঃ ২৯

২৩. মজুমদার, নেপাল ঃ *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, দে'জ, কলকাতা ঃ ১৯৯৫, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮০

২৪. ঘোষ, বিনয় ঃ *মেট্রোপলিটান মন ঃ মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা ঃ ১৯৯৪, পৃঃ ২-৪

২৫. তদেব, পৃঃ ৩০

২৬. মজুমদার, নেপাল ঃ *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১-৩

২৭. সরকার, সুশোভন ঃ *বাংলার রেনেসাঁস*, দীপায়ণ, কলকাতা ঃ ১৪০৮ পৃঃ ৭০

২৮. তদেব, পৃঃ ৭০

২৯. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পৃঃ ১৯৭

৩০. ব্যানার্জী, মল্লিকা ঃ "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই-একটি ভাবনা"। *ইতিহাসে নারী ঃ শিক্ষা*, সুপর্ণা গুপ্ত সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ঃ ২০০৯, পৃঃ ৪৭

৩১. Fanon, Frantz : *Ibid, p. 7*

৩২. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩২

৩৩. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ ঃ *স্বামী বিবেকানন্দ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৪৮

৩৪. ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র ঃ "মননে স্বরাজ"। *ইউরোকেন্দ্রিকতা ও শিল্প সংস্কৃতি*, অঞ্জন সেন সম্পাদিত, গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা ঃ ১৯৯২, পৃঃ ৯-১২

৩৫. রায়, দেবেশ ঃ *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ, কলকাতা ঃ ১৯৯১, পৃঃ ৯

৩৬. সেন, দীনেশচন্দ্র ঃ মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা ঃ ২০০৮, পৃঃ ।

৩৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ ঃ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ, কলকাতা ঃ ১৯৮৩, পৃঃ ১৪২

৩৮. তদেব, পৃঃ ১৪২

৩৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, পৃঃ ১৩২

৪০. "সমস্যা"। *সমালোচনা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, (অচলিত সংগ্রহ) দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯৩, পৃঃ ১৩৮

৪১. তদেব, পৃঃ ১৩৯

৪২. "স্বদেশী সমাজ"। *আত্মশক্তি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৯৩, পৃঃ ৫২৮

৪৩. তদেব, পৃঃ ৫২৯

৪৪. "স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট"। *আত্মশক্তি*, পৃঃ ৫৫৪

৪৫. "সফলতার সদুপায়"। *আত্মশক্তি*, পৃঃ ৫৬০

৪৬. "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ"। *আত্মশক্তি*, পৃঃ ৫৭৯

৪৭. তদেব, পৃঃ ৫৮০

৪৮. তদেব, পৃঃ ৫৮২

৪৯. তদেব, পৃঃ ৫৮২

৫০. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৭

৫১. তদেব, পৃঃ ১০৮

৫২. দ্রঃ রাশিদ আসকারীর প্রবন্ধ - "নারী-ভাবনা ঃ ইতিহাস ও সমীক্ষণ"। সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, *অমৃতলোক - ১০৪*, নারীবিশ্ব বিশেষ সংখ্যা, মেদিনীপুর ঃ ২০০৫, পৃঃ ৩৭-৫৭

৫৩. দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৭-৫৭

৫৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১১

৫৫. তদেব, পৃঃ ১১৬

৫৬. দ্রঃ ভট্টাচার্য, সুতপা ঃ *মেয়েদের লেখালেখি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ঃ ২০০৮

৫৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ঃ ২০০৭, পৃঃ ৯৮

৫৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৯

৫৯. "লোকহিত"। *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, ১৩৯৩, পৃঃ ২৬৩

৬০. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার নবজাগৃতি*, পৃঃ ১৪৩

৬১. দ্রঃ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬ - ১০০

৬২. David C, Mc Clelland : *The Achieving Society*, Princeton, 1961, p. 205 (বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫১)

৬৩. সরকার, সুশোভন ঃ *বাংলার রেনেসাঁস*, পৃঃ ৭৫-৭৬

৬৪. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩১৫-১৬

৬৫. ব্যানার্জী, মল্লিকা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২

৬৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে*, পৃঃ ৯৯

৬৭. রায়, ভারতী ঃ *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা*, আনন্দ, কলকাতা ঃ ২০১২, পৃঃ ৪

৬৮. "শিক্ষার বাহন"। *পরিচয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৯

৬৯. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পৃঃ ৩২৩

৭০. তদেব, পৃঃ ৩২৪

৭১. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা (সম্পাদিত) ঃ *রাসসুন্দরী দেবী ঃ আমার জীবন*, প্রয়াস প্রকাশন, কলকাতা ঃ ২০০২, পৃঃ ৩৮

৭২. *দেবী চৌধুরানী*, বঙ্কিম-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ঃ ১৩৬৯, পৃঃ ৮৭২

৭৩. বিশী, প্রমথনাথ (সম্পাদিত) ঃ *ভূদেব রচনাসম্ভার*, কলকাতা ঃ ১৩৬৯, পৃঃ ৪৫৬

৭৪. দ্রঃ রায়, ভারতী ঃ *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভূমিকা অংশ

৭৫. রায়, ভারতী ঃ *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৮

৭৬. তদেব, পৃঃ ৩০

৭৭. তদেব, পৃঃ ১০